সপ্তম সংখ্যা

রূপকথা

বাংলা ও বাঙালির কথা বলে

শীতের সবজি ও ফলের পুষ্টিগুণ

সম্পাদকীয়

সুষম খাদ্য জীবনীশক্তি জোগায়

একটি সুষম খাদ্য তালিকা জীবনীশক্তি, আনন্দ এবং সক্রিয়তা প্রদান করে। তাই সঠিক খাদ্যগ্রহণের মধ্যে দিয়ে আমরা জীবনকে সুন্দরভাবে ও এবং সুস্থভাবে উপভোগ করতে পারি। খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ভিটামিন ও মিনারেলসের অন্যতম উৎস হল শাক-সবজি এবং ফলমূল। মূলত, ভিটামিন ও মিনারেলস শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং আমাদের শরীরকে খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট ব্যবহারে সাহায্য করে। অর্থাৎ আমাদের শরীর রক্ষায় শাক-সবজি এবং ফলমূলের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বছরের প্রায় সবসময় কমবেশি শাক-সবজি ও ফলমূল মেলে। তবে ষড়ঋতুর আবর্তে শীতকালই শাক-সবজি ও ফলমূলের জন্য উপযুক্ত সময়। শীতের এই মরসুমি শাক-সবজি এবং ফল সঠিক সময়, সঠিক পরিমাণে গ্রহমের মাধ্যমে সহজেই শরীরের চাহিদা মোতাবেক পুষ্টি উপাদান, বিশেষ করে ভিটামিন ও মিনারেলসের ঘাটতি পূরণ সম্ভব হয়। বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় শীতকালীন শাক-সবজি এবং ফলের স্বাদ ও পুষ্টিও বেশি থাকে। প্রায় সব শাক-সবজিতেই থাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপাদান, যা ত্বকের বার্ধক্যরোধে বিশেষ ভূমিকা নেয় এবং ত্বকের সজীবতা ধরে রাখে। শীতকালে আমাদের শরীরে জলের ঘাটতি হয়। তা থেকেই আদ্রর্তার অভাবে শরীরে টান ধরে। এমন বেশ কিছু সবজি রয়েছে যার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জল থাকে। ওই সব সবজি শীতের সময় খেলে শরীরে জলের ঘাটতি পূরণ হয়। তাই এই মরসুমে শরীর ও স্বাস্থ্যের উপকারী ফলমূল ও শাক-সবজি খেয়ে শীতের আমেজ চুটিয়ে উপভোগ করুন।

সূচিপত্র

শুরুর পাতা	৩-৬
অমৃত কথা	৭-৮
কবিতা	৯-১০
চেনা মানুষ অজানা কথা	১১
ইতিহাসের কথা	১২-১৩
কৃষি কথা	১৪-১৫
আলোর দিশারী	১৬
হাতের কাজ	১৭
কর্পোরেট	১৮-১৯
স্বাস্থ্য	২০
রূপচর্চা	২১
আইন	২২-২৩
হেঁসেল	২৪
ভ্রমণ	২৫-২৬
সংস্কৃতি	২৭-২৯
খেলা	৩০

রূপকথা

প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা

প্রধান সম্পাদক
মানসকুমার ঠাকুর
নির্বাহী সম্পাদক
সৈকত হালদার
সহ-সম্পাদক
ঈপ্সিতা সেন
সহযোগিতায়
মধুমিতা দাস
পরিচালনা
মানসী রিসার্চ ফাউন্ডেশন

অক্ষরবিন্যাস	প্রচ্ছদ
ইন্দ্রবুবলি	**কুন্তল**

শীতে সুস্থ থাকার চাবিকাঠি

টাটকা সবজি ও ফলের পুষ্টিগুণ

আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট আয়ুর্বেদাচার্য আকবর হোসেন

শীতের আমেজ উপভোগ করতে কার না ভালো লাগে। মিঠে রোদে শরীরের ওম যেন স্বস্তি পায়। কিন্তু শীতে সুস্থ থাকাটাও শরীরের সঙ্গে একরকমের চ্যালেঞ্জ লড়ার সামিল। এই মরসুমে নানা রঙের সবজি ও ফল পাওয়া যায়। ধোঁয়া ওঠা গরম ভাতের সঙ্গে তাজা সবজির তরকারি যেমন জমিয়ে খাওয়া যায় তেমনই শীতকালীন রকমারি সবজি ও ফল শরীরে পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রোগীর পথ্যেরও কাজ করে। শরীর সুস্থ রাখতে এই সব সবজি ও ফলের গুণ প্রচুর। তেমনই কিছু সবজি ও ফলের কথা তুলে ধরা হল।

বাঁধাকপি

টাটকা সবজির মধ্যে বাঁধাকপি অন্যতম। খেতে সুস্বাদু। সহজে রান্না করা যায়। পরিপাক হতেও বেশি সময় লাগে না। বাঁধাকপিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ই। এছাড়াও রয়েছে সালফারের মতো খনিজ উপাদান। সমীক্ষায় দেখা গেছে, লেবুর জুসে যে পরিমাণ ভিটামিন সি থাকে বাঁধাকপিতে তার চেয়ে অনেক বেশি থাকে। কাঁচা বাঁধাকপি পাকস্থলীর বর্জ্য পরিষ্কার করে। এটি হজমে সহায়ক। কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতে এই সবজি কার্যকর। বাঁধাকপি ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসাবেও কাজ করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া মানুষের দেহের ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে, আলসার নিরাময় ও দেহে রক্ত সঞ্চালনে সাহায্য করে। এই কপি রাঁধতে হবে অল্প আঁচে। অনেকক্ষণ ধরে রান্না করলে কিন্তু বাঁধাকপির পুষ্টিগুণ কমে যায়।

টমেটো

পুষ্টিগুণে ভরপুর এই সবজিতে রয়েছে লাইকোপেন নামে এক উপাদান, যা বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধে কাজ করে। মানুষের ওপর করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, এই লাইকোপেন প্রস্টেট, স্তন, ফুসফুস, প্যানক্রিয়াস ও ত্বকেরক্যান্সার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এছাড়া চোখের রোগেরও উপশম করে। টমেটোতে অন্যান্য ভিটামিনের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে রাইবোফ্লোবিন, যা ঘন ঘন মাথাব্যথার ক্ষেত্রে ওষুধের মতো কাজ করে। এছাড়া ওজন কমানো, জন্ডিস, বদহজমেও কাজ দেয়। ডায়েরিয়া ও রাতকানা রোগে টমেটো হতে পারে সবচেয়ে ভালো পথ্য।

ঢ্যাঁড়স

এই সবজি আঁশে ভরা অর্থাৎ যাকে বলে ফাইবারযুক্ত। একদিকে এই সবজিতে যেমন রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন অন্যদিকে, রয়েছে কম মাত্রায় ক্যালোরি। সহজলভ্য এই সবজি ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সাহায্য করে। ঢ্যাঁড়সের ফাইবার সহজপাচ্য। এটি রক্তের সেরাম কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে হার্টের রোগের ঝুঁকি কমায়। সবজিতে রয়েছে উচ্চমাত্রায় ভিটামিন এ, আয়োডিন, ফলিক অ্যাসিড, জিঙ্ক। মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ প্রতিরোধে ঢ্যাঁড়স খুব ভালো কাজ করে। এছাড়া মেদ বা ভুঁড়ি কমাতে চাইলে ঢ্যাঁড়স খান নিয়ম করে।

গাজর

পুষ্টিগুণের বিচারে গাজর অনন্য। এছাড়া গাজরে বিটা ক্যারোটিন নামে এমন এক উপাদান রয়েছে, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ায়। গাজর শরীরের আর যেসব উপকার করে তা হল ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়, শ্বাসতন্ত্রের কর্মক্ষমতা বাড়ায়, হজমে সাহায্য করে, দাঁত, হাড় ও চুল শক্ত করে, আলসার প্রতিরোধ করে। গাজর ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়।

মুলো

প্রাচীনকালে মুলো শুধু সবজি হিসাবে খাওয়া হতো না, ওষুধ হিসাবেও এর ব্যবহার ছিল। মুলোয় রয়েছে উচ্চমাত্রায় কপার, ম্যাঙ্গানিজ ও পটাশিয়াম। এছাড়া মুলো ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক, সোডিয়ামের ভালো উৎস। এটি হজমে সাহায্য করে। রক্ত শুদ্ধ করে। ত্বকের সৌন্দর্যতা বাড়ায়।

ধনেপাতা

ধনেপাতায় রয়েছে ভিটামিন সি, এ ও ফলিক অ্যাসিড। যা ত্বকের উপকারের জন্য খুব দরকার। এই ভিটামিনগুলো প্রতিদিনের পুষ্টি জোগায়। ত্বক, চুলের ক্ষয়রোধ করে। মুখের ভেতরের নরম অংশগুলো রক্ষা করে। মুখ গহ্বরের ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করে। ধনেপাতায় থাকা ভিটামিন এ চোখের পুষ্টি জোগায়, রাতকানা রোগ দূর করে। ভিটামিন কে-তে ভরপুর ধনেপাতা হাড়ের ভঙ্গুরতা দূর করে শরীরকে শক্ত রাখে। তবে ধনেপাতা রান্নার চেয়ে কাঁচা খেলে উপকার বেশি। অ্যালজাইমার্স অর্থাৎ স্মৃতিনাশে যাঁরা আক্রান্ত তাঁদের ক্ষেত্রে ধনেপাতা বিশেষ উপকারী। ধনেপাতা শীতকালীন ঠোঁটফাটা, জ্বর জ্বর ভাব দূর করতে সাহায্য করে। কারণ, ধনেপাতায় রয়েছে ভিটামিন সি-তে ভরা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা দেহের কাঁটাছেড়া অংশগুলো শুকোনোর জন্য খুব জরুরি। ধনেপাতার বীজের তেলে রয়েছে নানা ওষুধি গুণ। যেমন, ব্যথানাশক, ওজন বাড়াতে সাহায্য করে, খিদে বাড়ায়। ধনেপাতা চিবানোর পর সেই থেঁতলে যাওয়া পাতার রস দিয়ে দাঁত মাজলে মাড়ি মজবুত করে, রক্ত পড়া কমে, মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। সারা বিশ্বে, বিশেষত এশিয়া মহাদেশে ধনে গুঁড়ো করে তরকারিতে মশলা হিসাবে খাওয়া হয়। গোটা ধনেও চিবিয়ে খাওয়া যায়। রাসায়নিক পদার্থ ছাড়া কিছু সুগন্ধি তৈরির জন্য ধনেপাতা ব্যবহার করা হয়। ধনেপাতার এত গুণের জন্য সবার উচিত প্রতিদিনের খাবারের মেনুতে এটি রাখা।

শীতে যে সব ফল আবশ্যক

কমলালেবু

প্রতিদিন একটি করে কমলালেবু স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণ উপকারী। এটি ভিটামিন সি-র প্রধান উৎস। এই ভিটামিন সি আবার একধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা শরীরের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া কমলায় রয়েছে ভিটামিন এ, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, প্রচুর ফাইবার ও মিনারেল। এই ফল ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে।

আপেল

প্রবাদেই আছে, প্রতিদিন একটি করে আপেল খেলে ডাক্তার দূরে থাকবে। অর্থাৎ দিনে একটি করে আপেল খেলে সুস্থ থাকা যায়। প্রচুর আঁশযুক্ত এই ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। নিয়মিত আপেল খেলে কোলন ক্যান্সার সহ বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধ করা যায়। এছাড়া আপেলে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, বি ১, বি ১২ ও বি ৬ রয়েছে।

বরই

শীতের জনপ্রিয় ফল বরই। বরই নানা জাতের হয়। যেমন, নারকেল কুল, আপেল কুল, ঝাউ কুল ইত্যাদি। এগুলো খুব উপকারী ও পুষ্টিকর।

ডালিম

ডালিম যেমন রসালো তেমনই খুব উপকারী। এই ফলকে অনেকে বেদানা, অনেকে আনার নামে ডাকে। ডালিম হার্ট ভালো রাখে। উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। প্রচুর ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ ফল। এছাড়াও এতে রয়েছে ভিটামিন সি। ডালিম রস কুষ্ঠরোগের উপকারে আসে।

আমলকি

শীতের ফলগুলোর মধ্যে আমলকির গুণ সবচেয়ে বেশি। এই ফলকে বলা হয় ভিটামিন সি-র রাজা। একটা আমলকি গোটা খেলে শরীর প্রচুর ভিটামিন সি পায়। আর এই ভিটামিন সি ত্বকের সুরক্ষা, মাড়ি মজবুত করতে ও ক্যান্সার প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

সবেদা

সবেদা নানা গুণে সমৃদ্ধ। সবেদায় যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন এ ও সি আর বি কমপ্লেক্স রয়েছে। ভিটামিন এ চোখ, ত্বক ও হাড়ের জন্য উপকারী। ভিটামিন-সি ইমিউনিটি গড়ে তোলে। এছাড়াও এই ফল ত্বক, চুল ও দাঁতের জন্য বেশ ভালো। পাকা সবেদায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম, কপার, আয়রন। এসব উপাদান শরীরের মেটাবলিক ফাংশন ঠিক রাখতে সাহায্য করে। সবেদায় প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে, যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতেও সাহায্য করে। এছাড়াও সবেদা ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে। ত্বক উজ্জ্বল রাখতে ও চুলের চকচকে ভাব বজায় রাখতে সবেদা কার্যকরী। এটি কোলেস্টেরল ও ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখে। বীজের নির্যাস কিডনির পাথর সারাতে ওষুধ হিসাবে ব্যবহার হয়।

শীতের ভোরে খেজুরের রসে হাজারো গুণ

কুয়াশা ঢাকা শীতের সকালে টাটকা এক গ্লাস খেজুরের রস, আহা! সত্যি যেন অমৃত। এই রস টাটকা চুমুক দিয়ে হোক বা জ্বাল দিয়ে খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনি এটা দিয়ে তৈরি গুড় ও পাটালিরও কোনো তুলনা নেই। শীতের পীঠে-পায়েসের এক উপাদেয় উপাদান খেজুরের রস। এর গুণ বিচার করতে বসলে দেখা যাবে শুধু স্বাদেই নয়, খেজুরের রস প্রচুর খনিজ ও পুষ্টিগুণেও ভরা। এতে ১৫-২০ শতাংশ দ্রবীভূত শর্করা থাকে, যা থেকে গুড় ও সিরাপ তৈরি হয়। খেজুরের গুড়ে আখের গুড়ের চেয়ে বেশি প্রোটিন, ফ্যাট ও মিনারেল রয়েছে। সকালে এই খেজুরের রসের সিরাপ দিয়ে রুটি খাওয়া যায়।

খেজুরের রসের গুণ

খেজুরের রসে প্রচুর এনার্জি রয়েছে। তাই একে ন্যাচরাল এনার্জি ড্রিঙ্ক বলা যেতে পারে। এতে গ্লুকোজের পরিমাণ বেশি থাকে। যাঁরা শারীরিক দুর্বলতায় ভোগেন, কাজকর্মে জোর পান না, খেজুরের রস তাঁদের জন্য খুব উপকারী। রস ও গুড় দুটোই খেলে উপকার মিলবে।

কোন সময় খাবেন

খেজুরের রস ভোরবেলা খাওয়া খুব উপকারী। সারারাত ধরে রস জমে থাকার পর সকাল সকাল টাটকা এই রস খেলে উপকার পাওয়া যায়। তবে সময় যত গড়াতে থাকে, তত এতে গাঁজন প্রক্রিয়া শুরু হয়। তখন রসের স্বাদ নষ্ট হয়, অম্লতা বাড়ে। অন্ধকারে এই প্রক্রিয়া কম হয়, কিন্তু দিনের আলোয় গাঁজন বেশি হয়। তাই বেলারদিকে রস খাওয়া ঠিক নয়। খেয়াল রাখুন, খেজুরের রসে যেন কোনো পোকামাকড় না থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও এক নব্য যুবক

একবার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এক নব্য যুবক শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে জানতে চান, 'ঠাকুর, আপনি যে বলেন, মন্দিরের ওই সাড়ে ৩ ফুট মা কালীর মূর্তি বিশ্বপ্রসবিনী জগন্মাতা। এই সাড়ে ৩ ফুট মাটির মূর্তি কি বিশাল বিশ্ব প্রসব করতে পারে? এ আমি বিশ্বাস করি না। সব বুজরুকি।'

ঠাকুর শিশুর মতো সহজভাবে বললেন, তাই নাকি? দাঁড়া, আমি মার কাছে শুনে আসি। মা-র মন্দির থেকে ফিরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ওই যুবাকে সঙ্গে নিয়ে উঠোনে এসে আকাশের দিকে আঙুল তুলে জানতে চাইলেন, আকাশে ওটা কী রে? যুবকটি উত্তর দিল, ওটা সূর্য। ঠাকুর জানতে চাইলেন, ওটা কত বড়ো? সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি উত্তর দিলেন, আজ্ঞে, পৃথিবীর থেকে ১৩ লক্ষ গুণ বড়ো। ১৩ লক্ষটা পৃথিবী ওই সূর্যের মধ্যে থাকতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, দূর শালা! ওটা তো ৫ নম্বরের ফুটবলের মতো, ছেলেরা মাঠে খেলা করে। ওর ভেতরে এত বড়ো বিশাল পৃথিবী একটা নয়, দুটো নয়, তের লক্ষটা থাকতে পারে? এও আমি বিশ্বাস করি না! যুবকটি বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বললেন, আজ্ঞে, সূর্য সত্যিই পৃথিবী থেকে ১৩ লক্ষ গুণ বড়ো। আপনি সূর্য থেকে ৯ কোটি ৮৬ লক্ষ মাইল দূরে আছেন কিনা তাই ওটাকে অত ছোটো দেখছেন।

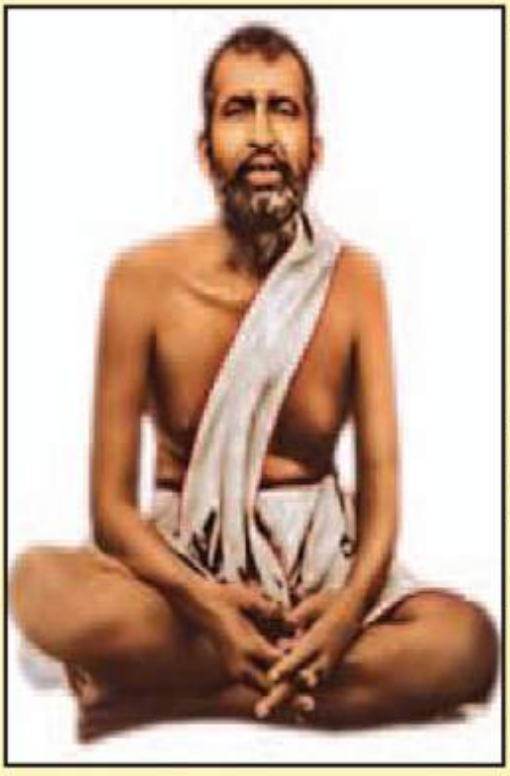

শ্রীরামকৃষ্ণ একগাল হেসে বলেন, তুই ও শালা, মা-র থেকে অনেক, অনেক দূরে আছিস, তাই মাকে সাড়ে ৩ ফুট দেখছিস। মা'র কাছে আয়, দেখবি তিনি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছেন।

মায়ের কৃপায় জীবন ফিরে পান

কে সি নাগ

কেশব চন্দ্র নাগ বা কে সি নাগকে আমরা সবাই বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ হিসাবে চিনি। সবাই তাঁর লেখা অঙ্কের বই থেকেই অঙ্ক শিখেছি। অথচ এই মানুষটি ছিলেন সারদা মায়ের কৃপাধন্য মন্ত্রশিষ্য। মায়ের দয়ায় তিনি জীবন ফিরে পান। ১৯৪২ সাল। খুব অসুখে পড়েন কে সি নাগ। দেশের বাড়ি গুড়াপে যান। সবাই চিন্তিত। গুড়াপে একজন ডাক্তার এসে তাঁকে দেখেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। রোগ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। পরিজনেরা ভয় পেলেন। তাঁর বাঁচার আসা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল। তবে ডাক্তার চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখলেন না। কে সি নাগের শ্বাসকষ্ট শুরু হল। ডাক্তার জানালেন, অক্সিজেন সিলিন্ডার লাগবে। বাড়ি থেকে কেউ একজন বর্ধমানে সিলিন্ডার আনতে গেল। কেশব নাগ পরে বলেছিলেন, 'ওই রাত এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে। কষ্টটা যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে, বুঝি ওটাই শেষ রাত। বাড়িতে

কারোর চোখে ঘুম নেই। আচমকা মায়ের কথা মনে পড়ল। মাকে অসুস্থ অবস্থায় সেবা করেছিলেন স্বয়ং মা কালী। আর আমার এই দুঃসময়ে মা কি আমায় বাঁচাবেন না? বারবার শুধু তাঁর কথাই ভাবছি, তাঁকে ডাকছি। হাত-পা নাড়ানোর ক্ষমতাও নেই। শুধু কাঁদছি আর কাঁদছি। এমন সময়ে একটা ঘটনা ঘটল। দেখলাম মায়ের মতো কে একজন আস্তে আস্তে আমার মাথার সামনে এসে দাঁড়ালেন। হ্যাঁ, মা'ই তো! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই সরু লাল পাড় শাড়ি। দু'চোখে করুণা ঝরে পড়ছে। মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। ওহ! সে কী সুখস্পর্শ! মনে হচ্ছিল আমি যেন সেরে উঠছি। হাত-পা নাড়তে পারছি। হয়তো বা কথাও বলতে পারব। মা আমাকে সাদা অনেকটা ন্যাপথলিনের মতো একটা গুলি খাইয়ে দিলেন। গুলিটা যতই গলা দিয়ে নামছে মনে হচ্ছে আমার সব রোগযন্ত্রণা নিয়ে ওই গুলি যেন শরীরে মিশে যাচ্ছে। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি কোনো খেয়াল নেই। ভোরবেলা ঘুম ভাঙল। মনে হল শরীরে আর কোনো কষ্ট নেই, কোনো যন্ত্রণা নেই, কোনো রোগ নেই। আমি পুরোপুরি সুস্থ। নিজেই বিছানা ছেড়ে উঠলাম। সবাইকে অবাক করে হাঁটলাম। সকালে ডাক্তার এলেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, ভগবানই তোমাকে বাঁচিয়েছেন। অক্সিজেন সিলিন্ডার ফেরত গেল। আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলাম। দ্বিতীয়বার জীবন পেলাম। আমার জীবনদাত্রী মা! কেমন করে ভুলি তাঁর অপার করুণা'!

রোমন্থন

সুপ্রীতি দত্ত

একমুঠো স্বপ্নের গুঁড়ো পেলাম,
ভুল করে জীবনের জলে মেশাতে গেলাম।
ভাবলাম জলে তো সব মেশে,
সুখ, দুঃখ, রাগ, অভিমানও মিশবে।
ভালোবাসা নামক চামচ দিয়ে,
অনেকবার নাড়াচাড়া করলাম।
রাতদিন তাকিয়ে রইলাম,
দ্রবণের অপেক্ষায়।
বুঝতে পারলাম ভুল করেছি,
স্বপ্নের গুঁড়ো গুলি যদি,
ফু দিয়ে উড়িয়ে দিতাম বাতাসে,
তবে স্বপ্নের রোমন্থন হতো।

নারী ও পুরুষ

মানস কুমার ঠাকুর

সৃষ্টির আলোর সকালে- সেই একই কথা
শুক ও সারি
মনের আড়ালে জেগে থাকে
একটি পুরুষ ও একটি নারী।
ঘুম ঘুম চোখ মেলতে চায় জীবনের রাঙা খোঁজে
হয় সে মহাপূণ্য
আছন্ন করে সমস্ত মনকে
প্রচ্ছন্ন সহানুভূতিকে
অজানা আবিষ্কারকে ভাবায়
জীবনের কোনো এক সত্যকে
জীবনের মানে খুঁজতে গিয়ে হারিয়ে যায় প্রস্ফুটিত
আলোতে।
যা আগুনের আগ্রাসী ক্ষুধা
সেই একই কথা
একটি পুরুষ ও একটি নারী।
আগুনের শেষ অংশে পড়ে থাকে ছাই
নীল আভায়।
ইচ্ছাকে জেনে নাও
চিনে নাও পরস্পরকে
প্রলয়ের নিঃশব্দ পদধ্বনি,
কোন সঙ্কটকে সে ভাবায়।
শেষ হয়ে যায় সম্পর্ক-
সুপ্ত পথচারী
একটি পুরুষ ও একটি নারী।
দিন শেষে হারিয়ে যায় আলো
হারিয়ে যায় ভালোবাসা
পড়ে থাকে স্মৃতি
স্মৃতিমাখা এক রাশ আশা
হায় ভালোবাসা
গড়ে ছিল যে-
একটি পুরুষ ও একটি নারী।

নীরবতার বয়স

তানিয়া

বয়স যতই বাড়ে শুরু হয়
নিজের সাথে নিজের আলাপন।
এ যেন এক অকারণ নীরবতার প্রেমকথন।
বয়সের প্রতিটা সন্ধিক্ষণ হয়ে ওঠে ...
নিজস্ব এক জীবন যাপন।
ছেড়ে যায় শতাধিক লোক দেখানো
প্রাচুর্যের অহমিকা,
দেখনদারি সম্পর্ক মুছে ফেলে
গোপনে কারো বা কাঁধে মাথা রাখা।
না হয় রইল দু চারেক বন্ধুস্বজন...
হয়তো বা জীবনের শেষ সূর্যাস্ত দেখা।
অপ্রত্যাশিত অপমান — নিন্দা — বিশ্বাস ভঙ্গতায়
পুরোপুরি চুপচাপ থাকা
এক ফালি হাসিতে এড়িয়ে যাওয়া
কিছু ধূসর লহর।
জীবন একটি লম্বা সফর ...
ছেড়ে আসা স্টেশনগুলো চুপচাপ
শুধুই গুনে চলে প্রহর।
কখন আসে সেই বহু প্রতীক্ষিত
নীরবতার খবর।

ভোরের ডায়েরি

ইন্দ্রনীল ব্যানার্জি

লিখতে লিখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ ভোর রাতের ঠান্ডায় ঘুম ভাঙার পর দেখলাম, গায়ের চাদর পড়ে আছে। ফায়ার প্লেসের আগুনটা গেছে নিভে। হাঁক দিলাম, 'বাহাদুর, থোড়া আগ জলা দো'। আওয়াজ এল, 'হা সাহাব'। ভেজানো দরজা খুলতেই দেখি রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে যাওয়া এক ইউরোপিয়ান চাগার দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে চলে গেল। রেখে গেল একরাশ ভাবনা।

ভাগ্যের কী নিদারুণ পরিহাস! এক সাদা চামড়ার মানুষ কিনা আমার মতো ছাপোষা বাঙালিকে বলে, 'সাহাব'। ঘড়িতে এখন ৫টা ছুঁই ছুঁই। কলকাতায় তো ভোর, এখানে এখনো অন্ধকার। এটা পশ্চিম, মাকালোস্কিগঞ্জ। জানলা খুলতেই একরাশ মিষ্টি বুনো গন্ধ মেশানো ঠান্ডা বাতাস, সঙ্গে রাত জাগা ক্লান্ত ঝিঁঝিঁর অনন্ত ডাক ঘরে ঢুকে পড়ল। থিতিয়ে থাকা আগুনটা এখন বেশ জেগে উঠেছে। ফেঁপে ফুলে ওঠা পুরনো ডায়েরিটার দিকে চেয়ে ভাবলাম, কী হবে ওতে আর ছাইপাঁশ লিখে। দিলাম ফেলে— এক মুহূর্তের স্তব্ধতা, লেলিহান শিখা গ্রহণ করে নিল, সানন্দে। ছড়িয়ে যাওয়া পাতাগুলোর সে কি আকুতি! কুঁকড়ে-মুকড়ে একটা শেষ চেষ্টা করছিল স্মৃতিকে ধরে রাখার। ওদিকে আর সময় না দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম চাদরটা নিয়ে, খালি পায়ে।

আকাশ সাদা হয়ে আসছে। পায়ের নীচে শিশির ভেজা ঘাস। একটু ঘোরাফেরার মাঝেই বাংলো বাড়ির চিমনির দিকে পড়ল নজর। দেখি, ভারী হাওয়ায় চিমনির ধোঁয়া বেশি উঠতে না পেরে কীরকম যেন খোলা আকাশের ক্যানভাসে এক চেনা ছবি এঁকে দিয়েছে। ফিরে এসে ফায়ার প্লেসের দিকে চোখ পড়ল। পূর্বের খোলা জানালা দিয়ে আসা আলোয় পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া দু'-একটা পাতার লেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সম্বিৎ ফিরল- 'সাহাব চায়ে পিজিয়েগা'?

কাছের মানুষ কাজের মানুষ সুব্রত মুখার্জি

মানস কুমার ঠাকুর

জননেতা সুব্রত মুখার্জি। এই নামটা এখন শুধুই স্মৃতি। সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তিনি। এই প্রবীণ রাজনীতিকের জীবনে বর্ণময় চারটি অধ্যায়- ছাত্রনেতা, শ্রমিক নেতা, বিধায়ক ও মন্ত্রী। এর সঙ্গে অবশ্যই তাঁর জীবনের আরেকটি স্মরণীয় অধ্যায় ছিল। কলকাতার মহানাগরিকের জীবন। জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের কাজের ক্ষেত্রে সুব্রত মুখার্জি নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছেন। কলকাতার মেয়র হিসাবেও কিন্তু তিনি ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছেন।

শুধু কাজের ক্ষেত্রে নয়, মানুষ হিসাবেও তিনি ছিলেন খুব রঙিন। হাসি-ঠাট্টা ও মজায় সবাইকে জমিয়ে রাখতেন। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। নিজের দলের সঙ্গে তো বটেই, বিরোধীদের সঙ্গেও সুব্রত মুখার্জির সখ্যতার সম্পর্ক ছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাতে গোনা যে কয়েকজন 'তুই' বলে সম্বোধন করেন তার মধ্যে সুব্রত মুখার্জি একজন।

রাজনীতির লোক না হলেও কাজের সূত্রে আমার সঙ্গে সুব্রত মুখার্জির অনেকদিনের পরিচয় ছিল। খুব দরকার না হলে আমি ওই সব ব্যস্ত মানুষদের থেকে দূরে থাকতাম। অকারণে বিরক্ত করতাম না। বেশ মনে আছে, ২০০৪ সালের ১৪ আগস্ট আমাদের হরিশ মুখার্জি রোডের অফিসে কলকাতা পুরনিগম থেকে জলের লাইন কেটে দেওয়ার নোটিশ এসেছে। আমি ঠিক এক মাস আগে কাউন্সিল সদস্য হয়েছি। ওই সময় যিনি কাউন্সিলের পূর্ব ভারতের চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি চাকরি করতেন। তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না এই সমস্যা মেটানো বা সময় দেওয়া। অগত্যা আমার ওপর দায়িত্ব পড়ল। আমি অনেক নেতা ধরে শেষ পর্যন্ত কলকাতার মেয়র সুব্রত মুখার্জির সঙ্গে দেখা করার সময় পেলাম। ওঁর ঘরে ঢোকামাত্র বেশ কিছু অফিসার জোর দিয়ে বলে উঠলেন, 'স্যার, ওনাকে আমরা বলেছি হাসপাতাল, রেস্টুরেন্ট, হোটেল কাউকেই ছাড়ছি না। কিন্তু উনি শুনছেন না'। তখন মেয়র হেসে বলেছিলেন, 'ওনারা কষ্ট করে কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়েছেন সহজে ছেড়ে দেওয়ার জন্য'? আমি একটু হলেও আশার আলো দেখতে পেলাম। উনি সেবার অনেক সাহায্য করেছিলেন। বলেছিলেন, ২৭ বছর ধরে জলের ট্যাক্স জমা দেয়নি। উনারা কী ব্যস্ত না মনে নেই। সুদে ছাড় দিয়েছিলেন। পরে ওনার সঙ্গে আবার দেখা হয় ২০১২ সালে। ওই সময়ে আমরা পঞ্চায়েতের ওপর ক্যাগে-র সঙ্গে একটা রিপোর্ট করি। আমার ওই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল 'অ্যানালিসিস অ্যান্ড বেঞ্চমার্কিং অফ পিআরআই পারফরম্যান্স'। সুব্রত মুখার্জি ডেকে বলেছিলেন, 'আমাকে ছোটো করে একটু বুঝিয়ে বলুন এই রিপোর্টে আমাদের কী উপকার হবে'? আমি বুঝিয়ে বলার পর উনি দু'বার ভাবেননি। আমাদের দিয়ে সারা বাংলা পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্টিং টেকনিক বিষয়ে একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম করিয়েছিলেন। ওঁর খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। কোন কাজটা কখন করাতে হবে সেটা খুব ভালো বুঝতেন। এরপরও বেশ কয়েকবার আমাকে ডেকেছিলেন অ্যাকাউন্টিং বিষয়ে আলোচনার জন্য। সুব্রত মুখার্জি আমাকে বারবার বলতেন, 'আপনারা পিছিয়ে রয়েছেন বুদ্ধিতে নয়, সামগ্রিক পারফরম্যান্সে। আপনাদের মধ্যে যাঁরা ডুয়েল কোয়ালিফায়েড তাঁদের উঠতে দেবেন না। এতে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়'। ওনাকে আমি ধন্যবাদ না দিয়ে পারব না। কারণ পঞ্চায়েতের স্বনির্ভরতা-এই বিষয়ে ওনাকে একটা ধারণা দেওয়ায় উনি আমাকে সমর্থন করেন। স্বীকার করে নেন, এই ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের পরিকাঠামো ও সদিচ্ছার খুব অভাব রয়েছে। আমি যখন ২০২০ সালে ওয়েবরেডা'র কার্যকরী বোর্ডের সদস্য হলাম ওই সময় কিছু প্রশ্ন করতেই উনি বলেছিলেন, 'আমাদের গভর্নিং বডিতে এই প্রথম অ্যাকাউন্টসের লোক চলে এসেছে। আপনি একটু দেখে নেবেন প্লিজ'। উনি তখন একজন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। পদাধিকার বলে ওয়েবরেডার চেয়ারম্যান হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কথা শুনতেন আর ভালো কাজের উৎসাহও দিতেন। আমার সঙ্গে যখন বসে কথা হত, তখন বলতেন, 'প্রোজেক্টের বাজেট আর খরচের পার্থক্যটা দেখুন। খরচ হবে কিন্তু খরচের পরিমাপ বা সুবিধা পাওয়া যাবে কি! আপনাদের পরামর্শ খুব জরুরি'। গতবছরের শেষের দিকে একবার দেখা হতেই মন্ত্রী বলেছিলেন, অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট বিষয়টি যদি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে আনা যেত তাহলে প্রশাসনের খুব সুবিধা হত। সুব্রত মুখার্জি আমাকে প্রায়ই বলতেন, রাজ্যের মন্ত্রালয়ে আপনাদের মতো একজন করে লোক দরকার। যাঁরা খরচ কমাতে সাহায্য করবে একইসঙ্গে প্রশাসনকেও শক্তিশালী করবে। আমার কাছে সুব্রত মুখার্জি ছিলেন সত্যি একজন কাছের মানুষ, কাজের মানুষ। প্রণাম সুব্রতদা, আপনি যেখানেই থাকুন, ভালো থাকুন।

ব্রিটিশ শাসনে প্রথম ফাঁসি

মধুমিতা দাস

দস্যু ও তস্করদের বাদ দিলে কোন বাঙালিকে প্রথম ফাঁসি দিয়েছিল ব্রিটিশরা? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই মাথায় আসবে ক্ষুদিরাম বসুর নাম। কিন্তু তা নয়। ১৯০৮ সালের ১১ আগস্টে ১৮ বছর বয়সী এই কিশোরের আগেও এক সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধ প্রাণ দিয়েছিলেন ব্রিটিশ ফাঁসিকাঠে। সময়টা ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট। তাঁর নাম মহারাজা নন্দকুমার। জন্ম ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে ভদ্রপুর বলে এক জায়গায়। এখন সেটি পড়ে বীরভূম জেলায়। মহারাজা নন্দকুমার, মুঘল অভিজাত শ্রেণির খেতাবপ্রাপ্ত অভিজাত এবং পলাশির যুদ্ধের সময় হুগলির ফৌজদার ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি নবাব মীরজাফরের দেওয়ান ছিলেন এবং কোম্পানি কর্তৃক দেওয়ানি লাভের পরে তিনি ছিলেন ৪জন উর্ধ্বতন নায়েবের অন্যতম। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম তাঁকে 'মহারাজা' উপাধি দিয়েছিলেন। বৈষ্ণব গুরু রাম ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন নন্দকুমার। সরকারি প্রশাসনিক কাজে বিশেষ করে রাজস্ব আদায়ে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন তিনি। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁকে কর আদায়ের কাজে বর্ধমান, নদিয়া এবং হুগলি জেলায় বহাল করে। তাঁর আগে এই দায়িত্বে ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। কিন্তু হেস্টিংসের কাজে সন্তুষ্ট ছিল না কোম্পানি। এই অপসারণ মেনে নিতে পারেননি তিনি। তাঁকে সরিয়ে কিনা দায়িত্ব দেওয়া এক নেটিভকে! অপমানে ক্ষোভে ফুঁসতে থাকেন সাহেব। ১৭৭৩ সালে হেস্টিংসকে বাংলার গভর্নর জেনারেল পদে আনা হল। এবার তাঁর বিরুদ্ধে লিখিতভাবে দুর্নীতির অভিযোগ আনলেন নন্দকুমার। অভিযোগ ছিল, মৃত নবাব মীরজাফরের বেগম মুন্নি বেগমের কাছ থেকে কয়েক কোটি অর্থ ঘুষ নিয়েছিলেন হেস্টিংস। বিনিময়ে নাবালক নবাব মুবারক-উদ-দৌল্লার অভিভাবক হিসেবে মুন্নি বেগমকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। রেগুলেটিং অ্যাক্ট-এর বিধানে গভর্নর জেনারেলকে কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হত। দুর্ভাগ্যবশত কাউন্সিলের চারজন সদস্যের তিনজনই হেস্টিংসের বিরুদ্ধে ছিলেন। নন্দকুমারের কারণে কাউন্সিলের বিরোধী তিনজন সদস্যের (ক্ল্যাভারিং, ফ্রান্সিস ও মনসন) সঙ্গে হেস্টিংসের সংগ্রামে তাঁকে অনেক বিব্রতকর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। কারণ, নন্দকুমার হেস্টিংস বিরোধীদের কাছে সব সময় তাঁর দুর্নীতির বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করতেন। কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় জমিদার ও মুন্নি বেগমের (মীরজাফরের স্ত্রী) কাছ থেকে হেস্টিংস যে উৎকোচ গ্রহণ করেছিলেন তা নন্দকুমার বিরোধী সদস্যদের কাছে ফাঁস করে দেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা গৃহীত কার্যবিবরণীতে উৎকোচ গ্রহণের বিষয়টি চিহ্নিত করে কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স-এর কাছে প্রেরণ করা হয়।

নন্দকুমারের বিচার-বিষয়ক তথ্যানুসন্ধান করে বেভারিজ বলেছেন যে, নন্দকুমারের প্রতি তাঁর অস্বাভাবিক বিদ্বেষের ফলে হেস্টিংস এই দুর্বৃত্তকে (তাঁর ভাষায়) প্রাপ্য শাস্তি দেওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন। হেস্টিংস নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করতে শুরু করেন। এ কাজে তেমন বেশি অগ্রগতি হওয়ার পূর্বেই জনৈক মোহনপ্রসাদ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ আনেন। সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের চার বছর পূর্বে একটি উইলে এ ধরনের জালিয়াতি করা হয় বলে অভিযোগ আনা হয়। সুপ্রিম কোর্ট নন্দকুমারের বিচার করে। রাজা নন্দকুমার ছিলেন একজন অভিজাত ব্রাহ্মণ যিনি নবাব ও ব্রিটিশ শাসন আমলে দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতার কাছাকাছি থেকে কাজ করেছিলেন, তা সত্ত্বেও কাউন্সিলরগণ তাঁকে জোরালোভাবে সমর্থন করেননি।

অথচ এদের জন্য কাজ করতে গিয়ে নন্দকুমার 'আইনি হত্যা'র শিকার হন। সুপ্রিম কোর্ট পূর্বে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগের বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে, কিন্তু পরে ভারতীয় আইনে জালিয়াতির জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান না থাকায় এবং এ ব্যক্তি ব্রিটিশ নাগরিক না হওয়ায় মৃত্যুদণ্ড থেকে কোর্ট তাঁকে অব্যাহতি দেয়। নন্দকুমারের ক্ষেত্রে এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা হয়নি। এর কারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে যে, প্রধান বিচারক এলিজা ইম্পে সে সময় ফাঁসি দেওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। নন্দকুমারের ফাঁসির কাহিনী নিয়ে লিখেছেন এমন লেখকদের অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারক স্যার এলিজা ইম্পের সহযোগিতায় হেস্টিংস এই 'আইনি হত্যা'র আয়োজন করেন। ওয়েস্ট মিনিস্টার স্কুলে ইম্পে ছিলেন হেস্টিংসের বন্ধু। শত্রুকে নির্মূল করে ইম্পে বন্ধুকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। ব্যাবিংটন মেকলের মতে, ইম্পে ছিলেন চরম প্রতিহিংসাপরায়ণ ও অসৎ চরিত্রের কুখ্যাত ব্যক্তি। ইম্পে সম্পর্কে মেকলের মন্তব্যের সঙ্গে লর্ড কর্ণওয়ালিসের মতের সাদৃশ্য রয়েছে। কর্ণওয়ালিস বোর্ড অব কন্ট্রোল-এর সভাপতির কাছে লিখিত বেশ কিছু চিঠিতে ইম্পের অর্থ লালসা, পক্ষপাত দোষ এবং নীচতা ও অসাধুতার উল্লেখ করেন। অভিযোগটি সাধারণভাবে প্রচলিত থাকলেও হেস্টিংস কর্তৃক তাঁর বন্ধু ইম্পেকে সরাসরি প্ররোচনা দেওয়ার বিষয়টি এখনও যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়নি। মুখ বন্ধ রাখার জন্য এর থেকে বিশাল অর্থ নন্দকুমারকেও দিতে চেয়েছিলেন হেস্টিংস। কিন্তু তা না নিয়ে পাল্টা অভিযোগ দায়ের করেন নন্দকুমার। মহারাজা নন্দকুমারকে সমর্থন করেন স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস এবং বেঙ্গল সুপ্রিম কাউন্সিলের অন্য সদস্যরা। হেস্টিংসের বিরোধী ছিলেন ফ্রান্সিস। কিন্তু কোনও লাভ হল না। কারণ ভারতের প্রথম চিফ জাস্টিস এলিজা ইম্পে ছিলেন হেস্টিংসের স্কুলের বন্ধু। তিনি রায় দিলেন নন্দকুমারের বিপক্ষে। ইতিমধ্যে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও তছরূপের অভিযোগ আনলেন হেস্টিংস। বললেন, জনৈক বোলাকি দাস শেঠের নাম ভাঙিয়ে ৭০ হাজার টাকা নিয়ে নিয়েছেন নন্দকুমার। আসল বোলাকি দাস শেঠ বহুদিন আগেই মৃত। এলিজা ইম্পের দৌলতে এই অভিযোগ সত্যি বলে প্রমাণিত হল। 'দোষী' সাব্যস্ত হলেন মহারাজা নন্দকুমার। তখন ব্রিটিশ আইন অনুসারে দুর্নীতি তহবিল তছরূপের শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। ফাঁসির দিন নির্ধারিত হল ১৭৭৫ সালের ৫ আগস্ট। মৃত্যুর স্থান নিজেই বেছেছিলেন মহারাজা নন্দকুমার। গঙ্গাকে সামনে রেখে মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিলেন তিনি। পূর্ণ হয়েছিল তাঁর শেষ ইচ্ছে। নির্দিষ্ট দিনে খুব শান্তভাবে ফাঁসির মঞ্চে উঠেছিলেন সত্তরোর্ধ্ব মহারাজা নন্দকুমার। ঠিক কোনখানে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল জানা যায় না। খিদিরপুর ব্রিজ থেকে হেস্টিংসের দিকে নামার দিকে হেস্টিংস মোড়ে (তৎকালীন কুলি বাজারে) একটি কুয়ো অনেকেরই চোখে পড়ে। ১৫ ফুট মতো গভীর। স্থানীয়ভাবে এই কুয়োটি 'ফাঁসি কুয়ো' বলেই পরিচিত। আজকের বিদ্যাসাগর সেতুর কাছেই আবিষ্কৃত হয়েছিল একটি প্রাচীন কুয়ো। মনে করা হয়, এই সেই স্থান যেখানে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল মহারাজা নন্দকুমারকে। তাঁর ফাঁসির জন্যই খনন করা হয়েছিল কুয়োটি। বাঙালিদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল, এটি একটি 'আইনি খুন'। ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন এই বাঙালি 'মহারাজ নন্দকুমার'। হতে পারে তিনি দেশ স্বাধীন করার জন্য ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করেননি, কিন্তু ব্রিটিশরাজ যে তাঁকে অন্যায়ভাবে ফাঁসি দিয়েছিল, তার একটা কারণ ছিল তিনি দেশীয় রাজাদের একত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন। হয়তো তিনি তার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। পলাশির প্রান্তরে নবাব সিরাজউদদৌল্লার সঙ্গে ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের যে যুদ্ধ হয়, তাতে নবাবের সঙ্গে যারা বেইমানি করেছিল, তাঁদের মধ্যে মহারাজ নন্দকুমারও ছিলেন। পরে তিনি ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনা করেন। ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত 'দ্য ট্রায়াল অব মহারাজা নন্দকুমার' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, মিডলটনের পত্রালাপ দাখিল করা হলে ওয়ারেন হেস্টিংস ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হতেন। ওয়ারেন হেস্টিংস, তাঁর বন্ধু এলিজা ইম্পের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ বের করেন। পরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও ইমপিচ করা হয়েছিল এলিজা ইম্পে এবং ওয়ারেন হেস্টিংসকে। কিন্তু দু'জনেই বেকসুর মুক্তি পেয়েছিলেন। মহারাজা নন্দকুমার চিহ্নিত হয়ে থাকেন অপরাধী হিসেবেই। স্বাধীনতার বহু পরে সেই মিথ্যে ভিত্তিহীন বদনামের তকমা দূর হয় তাঁর নাম থেকে।

এরপর ১৯ পাতায়

মাছের সঙ্গে হাঁস পালনে আয় দ্বিগুণ হবে

ডাঃ স্বপনকুমার শূর

গ্রামাঞ্চলে বাড়তি টাকা আয়ের সবচেয়ে ভালো উপায় হল হাঁস পালন। বাড়ির আশপাশে ছোটো পুকুর বা ডোবা থাকলেই হাঁস পালন করা যায়। মাংস ও ডিমের জন্য হাঁসের আলাদা জাত রয়েছে। তাছাড়া হাঁস এমন এক প্রাণী, যা জল ছাড়াও পালন করা যায়। আবার জলেও রাখা যায়। তবে জলের মধ্যে হাঁস পালনে করলে একটা সুবিধা আছে। সেই জলে হাঁসের পাশাপাশি মাছও চাষ করা যায়। এতে একই জায়গায় দুটো ব্যবসা সমানতালে চালাতে সময় অতিরিক্ত লাগে না, কিন্তু আয় দ্বিগুণ হয়ে যায়। হাঁসের জন্য উপযোগী ফার্মিং পদ্ধতি হচ্ছে দু'রকম। ডাক-কাম ফিশ ফার্মিং ও ডাক ফার্মিং উইথ রাইস।

মাছ চাষের সঙ্গে হাঁস পালনে কী সুবিধা

হাঁসের মল পুকুরে পড়ে সরাসরি জৈব সারের কাজ করে। তাই মাছ চাষে অন্য কোনো সার বেশি লাগে না। এদিকে, মাছের পক্ষে ক্ষতিকারক জলজ উদ্ভিদ ও পোকামাকড় খেয়ে হাঁস পুকুরের পরিবেশ ঠিক রাখে।

কী ধরনের পুকুর দরকার?

সারা বছর জল থাকে, মোটামুটি আয়তাকার মাঝারি মাপের পুকুরই ভালো।

মাছের সঙ্গে হাঁস পালনের জন্য কী কী করতে হবে?

পুকুর থেকে জলজ উদ্ভিদ তুলে ফেলতে হবে। আগাছা মারার জন্য বিঘা প্রতি ৩ ফুট জলের গভীরতার জন্য ৩০০ কিলোগ্রাম মহুয়া খোল ব্যবহার করতে হবে। মহুয়া খোল দেওয়ার ১০-১২ দিন পরে বিঘা প্রতি ৩০ কিলোগ্রাম কলিচুন পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হবে ও মহুয়া খোল দেওয়ার ২০-২২ দিনের মাথায় ভালো করে জাল টানতে হবে যাতে পাঁকে কোনো গ্যাস না থাকে।

বিঘা প্রতি কত মাছ ছাড়তে হবে?

বিঘা প্রতি ৮০০ টা ৪-৬ ইঞ্চি মাপের ৬ রকম জাতের চারাপোনা ছাড়তে হবে। প্রতি ২০টা চারাপোনার মধ্যে কাতলা ৪টে, সিলভার কার্প ৪টে, ঘেসো রুই ২টো, মৃগেল ৩টে ও আমেরিকান রুই ৩টে ছাড়তে হবে।

পুকুরে মাছ ছাড়ার পর পরিচর্যা কেমন হবে?

প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩০ কিলোগ্রাম চুন পুকুরের জলে ছড়াতে হবে। প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার করে জাল টেনে পাঁকের গ্যাস দূর করতে হবে। মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। এই জাতীয় চাষে মাছের জন্য কোনো খাবার দেওয়ার দরকার হয় না।

হাঁস পালনের জন্য করণীয়

পুকুর পাড়ে কম খরচে স্থায়ী জিনিসপত্র দিয়ে হাঁসের জন্য মজবুত ঘর তৈরি করতে হবে। প্রতিটা হাঁসের জন্য ৩-৪ বর্গ জায়গা দরকার। হাঁসের সংখ্যা অনুসারে সেই আকারের ঘর তৈরি করতে হবে। ঘরের এক কোণে ডিম পাড়ার জন্য কিছু শুকনো ঘাস রাখা দরকার। হাঁস পালনের জন্য ভালো জাতের সংকর হাঁস বাছাই করা দরকার।

বিঘা প্রতি জলার জন্য কত হাঁস রাখা যেতে পারে?

প্রতি বিঘা জলার জন্য ৩৫-৪০টা হাঁস রাখা যেতে পারে। প্রতি ১০টা হাঁসের মধ্যে একটা পুরুষ হাঁস রাখতে হবে।

হাঁসকে কী ধরনের খাবার দিতে হবে?

পুকুরে চরার সময় প্রাকৃতিক খাবার যেমন গেঁড়ি, গুগলি, জলের পোকা প্রভৃতি খেয়ে থাকে হাঁস। এই খাবার যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রতিটা হাঁসকে প্রতিদিন গড়ে ১০০ গ্রাম করে সুষম খাবার দিতে হবে।

হাঁসের রোগ নিরাময়ে করণীয়

একটু নজর রাখলেই হাঁসের ডাক বা খাবার ধরন দেখে বোঝা যায় তারা সুস্থ কিনা। হাঁসের চোখ ফ্যাকাসে হলে বা পাতলা পায়খানা করলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। হাঁসকে ডিম পাড়ার জন্য সন্ধ্যে থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত ঘরের মধ্যে রাখতে হবে। প্রতিদিন সকালে হাঁসের থাকার ঘর পরিষ্কার রাখতে হবে।

একবছর চাষ করার পর কত মাছ ও ডিম পাওয়া যাবে?

মাছ চাষের সঙ্গে হাঁস পালন পদ্ধতিতে ৪৫০ কিলোগ্রাম মাছ, ৪৫০০ ডিম ও প্রায় ৬০ কিলোগ্রামের মতো মাংস পাওয়া যেতে পারে।

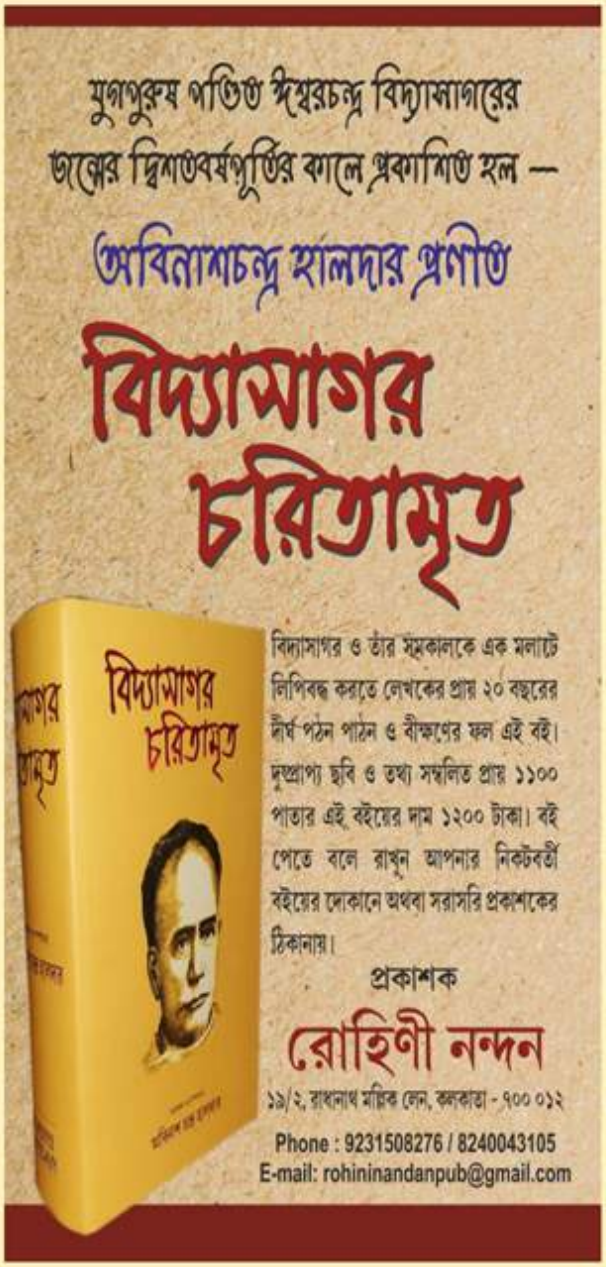

আয়ের দিশা দেখাচ্ছে হ্যান্ডলুম সোসাইটি

মালদার বামনগোলা ব্লকের সীমান্তঘেঁষা গ্রাম মহেশপুর। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষের আয়ের কোনো স্থায়ী সংস্থান নেই। এক ফসলি চাষের ওপর সারা বছর নির্ভর করতে হয়। এমনকী সবসময়ে চাষও ঠিকঠাক হয় না। এখন এই গ্রামের পিছিয়ে পড়া মেয়েদের আয়ের দিশা দেখাচ্ছে মহেশপুর হ্যান্ডলুম অ্যান্ড হ্যান্ডিক্র্যাফট সোসাইটি। গড়ে তোলা হয়েছে হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার। এর মাধ্যমে এই মুহূর্তে প্রায় সাড়ে পাঁচশো গরিব মেয়ের আয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। এই ক্লাস্টার গড়ে তোলা হয়েছে মহেশপুর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অধীনে। যার মূল উদ্যোক্তা হাসিনা খাতুন। অভিজাত মুসলিম পরিবারের মেয়ে হাসিনার মাধ্যমিক পাশ করার পরই বিয়ে হয়ে যায়। এরপর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে তিনি কলেজে ভরতিও হন। তাঁর বাপেরবাড়ি ও শ্বশুরবাড়িতে সাক্ষরতা অভিযানের বিভিন্ন ধরনের কাজ হত। এইসব দেখে গ্রামের পিছিয়ে পড়া মেয়েদের জন্য হাসিনারও কিছু করার ভাবনা আসে। শেষে এক সরকারি আধিকারিকের পরামর্শে ১৯৯৭ সালে গড়ে তোলেন মহেশপুর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। নাবার্ড ও নানা সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে মেয়েদের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ করেন। চালু করেন মেয়েদের হাতের কাজের ট্রেনিং। দিন দিন সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকায় তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। হাসিনার কাজ দেখে খুশি হয়ে ইডিআই, আমেদাবাদের পূর্বাঞ্চলের ট্রেনিং হেড সুবীর রায় তাঁকে হস্তশিল্পীদের ক্লাস্টার গড়ার অনুরোধ জানান। এরপর মালদা জেলাশিল্প কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার ও ব্লকের শিল্প উন্নয়ন আধিকারিক তাঁকে এই ব্যাপারে উৎসাহিত করেন ও সাহায্যের হাত বাড়ান। ২০০৯ সালে হাসিনা তৈরি করেন এই হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার। ৭জন আর্টিজান ক্লাস্টারের পরিচালকমণ্ডলীতে রয়েছেন। ক্ল্যাস্টারের সদস্য সংখ্যা এখন ৫০৫জন। ১০ কাঠা জমিতে তৈরি করা হয়েছে কমন ফেসিলিটি সেন্টার। এখানে এমব্রয়ডারি, হ্যান্ডলুম ও কাঁথার কাজের শাড়ি হয়। একই ছাদের তলায় কারিগররা যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পান। ক্ল্যাস্টারের সম্পাদক হাসিনা খাতুনের কথায়, 'সরকারি সংস্থা থেকে বরাত পেয়ে আর্টিজানদের নিয়ে জব কাজ করানো হয়। এক-একজন মাসে প্রায় ৮ থেকে ১০,০০০ টাকা আয় করেন। এছাড়াও নানা হস্তশিল্প মেলায় ওঁদের পণ্য বিপণনের ব্যবস্থা করা হয়। হাতের ডিজাইনে তৈরি এই সব শাড়ির ভালো চাহিদা রয়েছে। রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র ও বস্ত্র শিল্প দফতর থেকে আমাদের নানা ভাবে সাহায্য করা হয়। আগামী দিনে লক্ষ্য রয়েছে, বিশ্ববাজার ধরা ও আরো অনেক ক্লাস্টার গঠন করা।' উদ্যোগী হাসিনার সব কাজে প্রেরণা জোগান তাঁর স্বামী রফিউদ্দিন সরকার।

গয়নার বাক্স তৈরি

সব গয়না কি আর লকারে রাখা যায়! নাকি তাড়াহুড়োতে লকার খোলার সময় থাকে? তাছাড়া সোনা, রুপো না হয় লকারে তুলে রাখা যায়, কিন্তু রোজকার পছন্দের ইমিটেশনগুলো তো আর লকার বন্দি করা যায় না। তাই এবার ঘরে বসে গয়নার বাক্স তৈরির উপায় বাতলাচ্ছি।

উপকরণ

পিচ বোর্ড বা মাউন্ট বোর্ড, স্কেল, পেন্সিল, আঠা, কাঁচি, সেলোটেপ, রঙিন কাগজ, সোনালি বা রূপালি নেট, লেস, জরি, চুমকি।

বাক্সের উপাদান কোথায় পাবেন

পিচ বোর্ড বা মাউন্ট বোর্ড পেপার যে কোনো স্টেশনারি দোকানে পাবেন। এসবের পাইকারি বাজার শিয়ালদহের বৈঠকখানা বাজার। নেট বা লেস যেখানে পাওয়া যায়, সেখানেই জরি, চুমকি পেয়ে যাবেন। বড়বাজারের খ্যাংড়াপট্টিতে গেলে ভালো কালেকশন পাবেন।

তৈরির উপায়

সাধারণভাবে গয়নার বাক্স উচ্চতায় ৩ ইঞ্চি মতো হয়। এই ফর্মা অনুযায়ী বানাতে চাইলে ৭ ইঞ্চি মাপের একটা ত্রিভুজ মেপে এঁকে নিন। ত্রিভুজের ৩টে বাহুর ওপর থেকে ৩ ইঞ্চি মাপ করে দাগ দিয়ে নিন। দাগ অনুযায়ী বোর্ডটা কাটুন। ত্রিভুজের জন্য যে ৭ ইঞ্চি করে দাগ দেওয়া হয়েছিল তা কিন্তু কাটবেন না। দাগ অনুযায়ী সেগুলো ভেতরের দিকে ভাঁজ করে ভাঁজটা আবার খুলে দিন। এবার কাটা বোর্ডটা রঙিন কাগজের ওপর রেখে দাগ দিয়ে কেটে নিন ও বোর্ডের সঙ্গে কাগজটা জুড়ে দিন। আবার ভেতরের দিকে ভাঁজ করুন। এবার বাইরের কাটা অংশগুলো সেলোটেপ দিয়ে জুড়ে দিন। পেপার দিয়ে বাইরেটা মুড়ে নিন। আপনার বাক্সের নীচের অংশটা তৈরি হয়ে গেল। এবার ঢাকনার পালা। ঢাকনার জন্য বাক্সের যা মাপ তার থেকে একটু বেশি নিতে হবে মানে ৭.৩। ঢাকনাটি উচ্চতায় হবে ১.১। বাক্সের নীচের অংশের মতো একইভাবে ঢাকনাটি হবে। ব্যাস আপনার গয়নার বাক্স তৈরি। এবার আপনি পছন্দ মতো ডেকরেশন করে নিন। ঢাকনাটি সোনালি বা রূপালি নেট দিয়ে ঢেকে দিলে দেখতে বেশি ভালো লাগে।

ক্ষুদ্র শিল্প বাঁচাতে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে

অতিমারির পর রাজ্যের ছোটো শিল্প কী অবস্থায় দাঁড়িয়ে? শিল্পের নানান সমস্যা ও তার সুরাহার পথ জানাচ্ছেন ফেডারেশন অফ অ্যাসোসিয়েশন অফ কটেজ অ্যান্ড স্মল ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি **হিতাংশু কুমার গুহ**।

প্রশ্ন : অতিমারির পরের পর্যায়ে ছোটো শিল্পের হাল কেমন?

হিতাংশু : ক্ষুদ্র ও ছোটো শিল্পের সমস্যা অনেক পুরনো। দু'বছর ধরে অতিমারি ও লকডাউনের জেরে এই সমস্যা আরো বেড়েছে। অতিমারির পরের পর্যায়ে মাঝারি ও বড়ো শিল্পের হাল খানিক ফিরলেও ছোটো শিল্পের হাল এখনো ফেরেনি। উলটে আরো সংকট নেমে এসেছে। এই দু'বছরে ছোটো ছোটো অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। আরো বেশ কিছু বন্ধ হওয়ার মুখে।

প্রশ্ন : মূল সমস্যাটা কী?

হিতাংশু : একাধিক সমস্যায় ছোটো শিল্প জর্জরিত। কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলব! প্রথম সমস্যা, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য-সামগ্রী ছাড়া অন্য ধরনের পণ্যের তেমন চাহিদা নেই। স্থানীয় বাজার নেই। লোকের হাতে টাকা নেই। বাজারে টাকা না খাটলে টাকা আসে না। এই দু'বছরে জীবনের নিরাপত্তার তাগিদে লোকেরা অনেক বেশি সঞ্চয়মুখী হয়েছেন। ফলে বিনিয়োগ কমেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বা কেমিক্যাল শিল্প ঘোর সংকটে পড়েছে। ফেব্রিকেশন বা গ্রিল তৈরি রাজ্যের সম্ভাবনাময় ছোটো শিল্প। নানা জেলায় এই ফেব্রিকেশনের ছোটো ছোটো অনেক কারখানা রয়েছে। এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল লোহা। কিন্তু গত দু'বছরে লোহার দাম ১০০ গুণ বেড়েছে। চড়া দামে ছোটো ছোটো শিল্পের পক্ষে সেসব কেনা সম্ভব হচ্ছে না। বাজারেও বরাত পাচ্ছে না। সরকারি নিয়ম অনুসারে, আচমকা কর্মী ছাঁটাইও করতে পারছে না। ফলে বাধ্য হয়ে অনেক সংস্থা ঝাঁপ বন্ধ করে দিচ্ছে।

প্রশ্ন : আর কী সমস্যা আছে?

হিতাংশু : ছোটো শিল্পের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা পুঁজি। গত বছর কেন্দ্রীয় সরকার জরুরি ভিত্তিতে ছোটো শিল্পের জন্য সব ব্যাঙ্ককে কম সুদে ঋণ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সেসব বকেয়া ঋণ মেটানোর জন্য এখন ব্যাঙ্ক চাপ দিচ্ছে। তা দিতে ছোটো ছোটো ইউনিটের পক্ষে সমস্যা হচ্ছে। কারণ বিক্রিবাটা নেই। এছাড়াও অনেক সংস্থা সরকারি বরাতে কাজ করে। ক্ষুদ্র শিল্পের নিয়ম অনুযায়ী, ৪৫ দিনের মধ্যে বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিতে হয়। কিন্তু সমস্যা হল, সরকার থেকে টাকা দিতে অনেক দেরি করে। এসব ছাড়াও জিএসটি রিটার্ন অনেক সমস্যা ডেকে আনছে। এই রিটার্নের ক্ষেত্রে অনেক নথিপত্র জমা দিতে হয়। গ্রামের ছোটো ছোটো উদ্যোগীদের ক্ষেত্রে তা সমস্যা এনেছে।

প্রশ্ন : অতিমারিতে কি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পোশাক শিল্প?

হিতাংশু : অসংগঠিত ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত। পোশাক ও বস্ত্র শিল্পে ভীষণ প্রভাব পড়েছে। আমাদের দেশে কৃষির পরে এই শিল্পে সবচেয়ে বেশি লোক জড়িত। প্রায় ১১ মিলিয়ন লোক পোশাক শিল্পে জড়িত। এরমধ্যে ৮ মিলিয়ন লোক ডোমেস্টিক ক্ষেত্রে আর

৪ মিলিয়ন লোক আউটসোর্সিংয়ে আছে। এছাড়াও অনেক লোক পোশাক শিল্পের অনুসারী ইউনিট এমব্রয়ডারি, ওয়াশিং, লন্ড্রি আর প্যাকেজিং-সহ নানা ক্ষেত্রে আছে। হস্তশিল্পও খুব মার খাচ্ছে। এসব হাতের কাজের জিনিস বিক্রির সবচেয়ে বড়ো জায়গা সরকারি মেলা। কিন্তু অতিমারির জন্য গত দু'বছর ধরে মেলা বন্ধ।

প্রশ্ন : এই সংস্থার পথ চলা কবে শুরু?

হিতাংশু : ফেডারেশন অফ অ্যাসোসিয়েশন অফ কটেজ অফ স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ (ফ্যাকসি)-র রেজিস্ট্রেশন হয় ১৯৭২ সালে। তার দু'বছর আগে থেকে এই সংস্থা কাজ শুরু করে। আমাদের প্রথম সভাপতি ছিলেন বিপ্লবী শান্তিময় গাঙ্গুলি ও দ্বিতীয় সভাপতি ছিলেন এন এন দত্ত। নানা ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্পের সমিতি যেমন আমাদের সদস্য, তেমনি সরাসরি ক্ষুদ্র উদ্যোগীরাও আমাদের সদস্য। এই সংস্থা ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্য কাজ করে। ২০০৪ সালে সার্ক অন্তর্ভুক্ত সব দেশ নিয়ে ৩ দিনের সম্মেলন করি। এটা ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল।

প্রশ্ন : এই সমস্যা মেটানোর উপায় কী?

হিতাংশু : ক্ষুদ্র শিল্প আমাদের দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এই শিল্পের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি কাজের সুযোগ তৈরি হয়। ক্ষুদ্র ও ছোটো শিল্পের সমস্যা মেটাতে সরকারকে আরো উদ্যোগী হতে হবে। নানা ক্ষেত্রে ছাড় দিতে হবে। সরকারের নানা বিভাগ থেকে যেমন বরাত দিতে হবে, তেমনি বকেয়া টাকা তাড়াতাড়ি মেটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কাঁচামাল সরবরাহ ও বিক্রির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। ব্যাঙ্ককে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও উদার হতে হবে।

১৩ পাতার পর

ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে যাওয়া হিজল কথা

খড়গপুর আইআইটি'র নাম যেমন অনেকেই শুনেছেন তেমন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে চাক্ষুষও করেছেন। অনেকে আবার এখান থেকে হয়তো শিক্ষাও নিয়েছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রযুক্তিবিদ্যার পীঠস্থান ও বিজ্ঞান চর্চার ভারকেন্দ্র এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুরাতন ভবনের ইতিহাস ক'জন জানেন বা মনে রেখেছেন? দুর্গাপুজোয় যাঁরা কলকাতায় ঠাকুর দেখতে যান, তাঁরা 'সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার' নামটির সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু কে ছিলেন এই 'সন্তোষ মিত্র', তাঁর খোঁজ রাখেন কি?

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ব্রিটিশদের দ্বারা বন্দিদের হত্যার নির্মম কাহিনী একটা-দুটো নয়, রয়েছে অজস্র। তেমনই একটি ঘটনা হল 'হিজলী হত্যাকাণ্ড', যা আজ ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর হিজলী হত্যাকাণ্ড ঘটে। ইংরেজদের গুলিতে প্রাণ হারান দুই বিপ্লবী। একজন সুভাষচন্দ্র বসুর সহপাঠী সন্তোষ মিত্র। অন্যজন, মাস্টারদা সূর্য সেনের সহকর্মী তারকেশ্বর সেনগুপ্ত। এখন যেখানে খড়্গপুর আইআইটি'র পুরাতন ভবন, পরাধীন ভারতে সেখানেই ছিল হিজলী বন্দি নিবাস। অদূরে প্রথম মহিলা জেল। ১৬ সেপ্টেম্বরের সেই রাতে হিজলী বন্দি নিবাসে 'পাগলা ঘণ্টা' বাজিয়ে নির্বিচারে গুলি চালায় ইংরেজ পুলিশ। খবর পেয়ে সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত হিজলীতে আসেন। হিজলী ও চট্টগ্রাম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ওই বছর ২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতায় এক সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হিজলী শহিদ ভবনের পাশেই শহিদচক। প্রতি বছর ১৬ সেপ্টেম্বর সেখানেই শহিদ দিবস পালিত হয়।

প্রথমে জেনে নেওয়া যাক হিজলী'র ইতিহাস

কাশীদাসী মহাভারতের কথা। পঞ্চপাণ্ডব বনবাসে চলেছেন। গভীর জঙ্গল। মাতা কুন্তী বড়ো ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে চাইলেন। এদিকে ঘন জঙ্গলে থাকে নরখাদক রাক্ষস। রাক্ষসদের রাজা হিড়িম্ব আর তার বোন হিড়িম্বা। সে ভয়ে পাণ্ডবরা দমে যাওয়ার পাত্র নন! কাজেই মহাবলী ভীম বললেন, 'আমি আছি তো! কোনো ভয় নেই'। পাণ্ডবরা জঙ্গলেই বিশ্রাম নিতে বসলেন, আর ভীম পাহারা দিতে লাগলেন। এদিকে নরখাদক হিড়িম্ব তো আহ্লাদে আটখানা! সে চলল ভুরিভোজ সারতে। ভীমও এত সহজে তা হতে দেবেন না! তাই লেগে গেল ভীম আর হিড়িম্ব'র যুদ্ধ। ভীম হিড়িম্বকে বধ করে দেহ রেখে এলেন।

গরম জলেই মুশকিল আসান

সম্প্রতি জাপানের একদল চিকিৎসক জানিয়েছেন, বেশ কিছু শারীরিক সমস্যায় গরম জল একশো ভাগ কার্যকর। যেমন, মাইগ্রেন, উচ্চ রক্তচাপ, নিম্ন রক্তচাপ, জয়েন্টর ব্যথা, আচমকা হার্টের গতি কমা ও বাড়া, কোলেস্টেরল বাড়া, কাশি, শারীরিক অস্বস্তি, ঘাড়ের ব্যথা, হাঁপানি, সর্দি, শিরায় বাধা, ঘুম কম হওয়া, পেটের সমস্যা, খিদের সমস্যা, মাথা ব্যথা, জরায়ুর সমস্যা।

কীভাবে গরম জল খাবেন?

নিয়মিত রাত ১০-১১টার মধ্যে ঘুমিয়ে সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে প্রায় ২ গ্লাস জল খেতে হবে। প্রথম দিকে ১ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। গরম জল খাওয়ার পর ৪৫ মিনিট কোনো কিছু খাওয়া যাবে না।

গরম জল থেরাপি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই সব সমস্যার সমাধান করে :

- ৩০ দিনের মধ্যে ডায়াবেটিস
- ৩০ দিনের মধ্যে রক্তচাপ
- ১০ দিনের মধ্যে পেটের সমস্যা
- ৯ মাসের মধ্যে সব ধরনের ক্যান্সার
- ৬ মাসের মধ্যে শিরার বাধার সমস্যা
- ১০ দিনের মধ্যে খিদে জাতীয় সমস্যা
- ১০ দিনের মধ্যে নাক, কান ও গলার সমস্যা
- ১৫ দিনের মধ্যে মেয়েদের সমস্যা
- ৩০ দিনের মধ্যে হার্টের সমস্যা
- ৪ মাসের মধ্যে কোলেস্টেরল সমস্যা
- ৯ মাসের মধ্যে মৃগী ও পক্ষঘাতের সমস্যা
- ৪ মাসের মধ্যে হাঁপানির সমস্যা দূর করে।

জরুরি পরামর্শ

ঠান্ডা জল খাওয়া খুব ক্ষতিকর। ঠান্ডা জল হার্টের ৪টে শিরা বন্ধ করে দেয় যা হার্ট অ্যাটাকের কারণ। হার্ট অ্যাটার্কের অন্যতম কারণ হল কোল্ড ড্রিঙ্কস। এটা লিভারের সমস্যা তৈরি করে। ঠান্ডা জল পেটের ভেতরের দেয়ালকে প্রভাবিত করে। এটি বৃহদন্ত্রকে প্রভাবিত করে যার ফলে ক্যান্সার হতে পারে।

শীতে ত্বকের জেল্লা ধরে রাখুন সহজেই

জরুরি পরামর্শ দিয়েছেন **রূপ বিশেষজ্ঞ স্বাতী দত্ত**

শীতকালে বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকায় ত্বক থেকে জল বাষ্পীভূত হয়ে যায়। এতেই ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়ে। শীতের সময় ত্বকের শুষ্কতার কারণ তেল নয়, জলের অভাব। তাই এই সময় ত্বক ভালো রাখতে ঠিকমতো স্নান করতে হবে। স্নানের পর এক মগ জলে একটু তেল মিশিয়ে সবটা গায়ে ঢাললে ত্বক জল ধরে রাখতে পারে অনেকক্ষণ পর্যন্ত। ফলে ত্বক ফাটার সমস্যা হয় না। এছাড়া বেশ কয়েকটি সহজ উপায় রয়েছে।

- পাকা পেঁপে চটকে তার সঙ্গে মধু মিশিয়ে মুখে, হাতে গলায় লাগিয়ে ২০ মিনিট পর ধুয়ে ফেললে ত্বকের খসখসে ভাব দূর হয়।
- শুষ্কতার জন্য ত্বক ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেলে তাজা গোলাপের পাপড়ি, দুধের সর ও ২ ফোঁটা মধু একসঙ্গে মিশিয়ে লাগাতে পারেন।
- শীতকালে প্রতিদিন ১ কাপ করে গাজরের রস খেলে ত্বকের শুষ্কতার সমস্যা দূর হয়।
- শুষ্কতার জন্য শীতের সময় মুখে নানারকম দাগ হয়। রাতে শোওয়ার আগে ১ চামচ শসার রস, ৪ ফোঁটা পাতিলেবুর রস ও অল্প জল মিশিয়ে তা মুখে মেখে ঘুমোতে গেলে উপকার পাওয়া যায়।
- চারটে কদম গাছের পাতা, চারটে পদ্ম পাপড়ি বেটে তার সঙ্গে ২ ফোঁটা পিপারমেন্ট অয়েল মিশিয়ে লাগালে ত্বকের জৌলুস বাড়ে।
- ত্বকের পোড়াভাব কাটাতে রোদ থেকে ফিরে গাজরের রস তুলো দিয়ে মুখে লাগালে উপকার পাবেন।
- শীতের সময় অনেকের আঙুলের ডগা লাল হয়ে ফেটে যায়। এরকম হলে গোলাপ জল, পাতিলেবুর রস ও গ্লিসারিন মিশিয়ে তা শোয়ার আগে আঙুলে লাগালে উপকার মিলবে।

- পা ফাটা আটকাতে জলে হার্বাল কোনো শ্যাম্পু ফেলে প্রতিদিন পা পরিষ্কার করতে হবে।
- চুল পড়ার সমস্যা দূর করতে ধনে পাতার রস চুলের গোড়ায় লাগিয়ে ৩০ মিনিট পরে ধুয়ে ফেলুন।
- খুসকি দূর করতে শসার রস উপকারী। আবার মৌরি বাটা মাথায় লাগিয়ে ২৫-৩০ মিনিট পর ধুয়ে নিলেও খুসকি দূর হয়।
- কনুইয়ের কালো ছোপ দূর করতে হলে কলা আর চিনি মিশিয়ে ওই জায়গায় ঘষুন। এতে মাস খানেকের মধ্যেই সমস্যা মিটে যাবে।
- ফাটা নখের সমস্যা দূর করতে হলে জেলেটিনের জলে অন্তত মিনিট দশেক নখ ডুবিয়ে রাখুন।
- ২ কোট করে নেল পালিশ পরলেও নখ ফাটার সমস্যা কমে।
- ঠোঁট ফাটার হাত থেকে রেহাই পেতে গোলাপ জল, গ্লিসারিন ও পাতিলেবুর রস ব্যবহার করা যেতে পারে।
- দুধের সর আর মধু মিশিয়ে লাগালেও ফাটা ঠোঁটের সমস্যা দূর হয়।
- চুল পড়া রোধ করতে বকুলের ছাল, অশোকের ছাল ও অশ্বগন্ধা মিশিয়ে ২ চামচ মতো ভিজিয়ে দিনে একবার করে খেলে উপকার পাওয়া যাবে।

স্ত্রীদের হাতে নির্যাতিত স্বামীরাও

পারিবারিক নির্যাতন বলতে অধিকাংশ মানুষ নারী নির্যাতনকেই বোঝেন। আমাদের সমাজে এই ধারণাটাই মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে। কিন্তু আরেকটা চরম বাস্তব কেউ মানতেও চায় না বা বুঝতেও চায় না সেটা হল একজন পুরুষও নির্যাতিত হতে পারেন।

নির্যাতন মানেই শুধু গায়ে হাত তোলা বা শারীরিক নির্যাতন নয়। মানসিক নির্যাতনও একজনের জীবন শেষ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সত্যিটা হল, অধিকাংশ স্ত্রী না বুঝেই নিজের স্বামীকে মানসিক নির্যাতন করে থাকেন। অনেক মহিলা কখনো ইচ্ছায় কখনো কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে স্বামীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এই নির্যাতন করে থাকেন।

সমাজের ধারণাটা এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যে অনেক পুরুষই তাঁর পুরো জীবনে বুঝতে পারেন না যে তিনি স্ত্রীর দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন।

সব বিষয় নিয়ে অযথা ঘ্যানঘ্যান বা ঝগড়া

এটা প্রায় সব সংসারেই হয়। একটা তুচ্ছ বিষয়কে বিশাল বানিয়ে ফেলা। বাজার করা বা জিনিস গুছিয়ে রাখার মতো সামান্য বিষয় নিয়ে স্ত্রীরা সারাক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করতে থাকেন। সামান্য সেই বিষয়কেই তাঁরা বিশাল ঝগড়ায় পরিণত করেন।

তোমাকে বিয়ে করে আমার জীবন নষ্ট

এই কথাটা প্রায় কম-বেশি সব প্রায় স্ত্রী বলে থাকেন। একবারও তাঁরা ভেবে দেখেন না যে, কথাটা শুনে স্বামী এতে কী পরিমাণ কষ্ট পেতে পারেন। স্ত্রীরা যে এই কথা শুধু স্বামীকেই বলেন তা নয়, বাপের বাড়িতেও প্রায় সময় বলে বেড়ান। ফলে যা হওয়ার তাই হয়। স্বামী বেচারা মনে মনে কষ্ট পান, নিজেকে অযোগ্য মনে করতে থাকেন। সব মিলিয়ে মানসিকভাবে নির্যাতিত হতে থাকেন।

আকাশচুম্বী চাহিদা

এটা যে কত বড়ো একটা অত্যাচার, তা আমাদের দেশের অনেক স্বামীই হাড়ে হাড়ে বোঝেন। এমন স্ত্রীয়ের সংখ্যা প্রচুর যাঁদের চাহিদা কখনো শেষ হয় না। স্বামীর কতটা সাধ্য আর সীমাবদ্ধতা তাঁরা বুঝতে চান না। ক্রমাগত এমন জিনিসের দাবি করে যান যেগুলো দেওয়া স্বামীর পক্ষে সম্ভব নয়। আর এই অন্যায্য দাবির চাপে পড়ে

পিষতে থাকেন স্বামী নামক পুরুষটি।

সর্বক্ষণ উপদেশ

হ্যাঁ, সংসারের বিষয়ে একজন স্ত্রী অনেক বেশি জানেন, একথা ঠিক। একজন স্বামী হয়তো জানেন না কীভাবে ঘর সামলাতে হয় বা সন্তানকে মানুষ করতে হয়। মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে। স্বামী একটা কিছু পারেন না বা ভুল করলেন মানেই তাঁকে সারাক্ষণ উপদেশ দিতে হবে, এমনটা নয়। এটা একেবারেই ভুল। যদিও বেশিরভাগ স্ত্রীই এই কাজটাই করে থাকেন। তাঁদের উপদেশ আর চেঁচামেচির কারণেই স্বামীরা মিথ্যা বলতে বাধ্য হন।

নিজেকে স্বামীর জীবনে বোঝা বানিয়ে ফেলা

একজন পুরুষ একজন মহিলাকে বিয়ে করেছেন বলেই সারা জীবন স্বামী হিসেবে স্ত্রীয়ের সব দায়িত্ব টেনে যাবেন এটা কেমন কথা! দাম্পত্য একটা সমতার সম্পর্ক, দাম্পত্য মানে স্বামী ভারবাহী গাধা নন। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ স্ত্রী নিজের সব দায়িত্ব স্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। কখনো বুঝতেও পারেন না যে স্বামীর জন্য এটা কত বড়ো একটা বোঝা।

স্ত্রীদের মনে রাখতে হবে, স্বামী মানে তাঁর হুকুমের গোলাম নন। দাম্পত্য একটা গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক। চাল ডালের হিসাব কষতে গিয়ে সামান্য কারণে এই সম্পর্কটা বিষিয়ে তুলবেন না। স্বামীকে হাতের মুঠোয় বন্দি করে তাঁর ওষ্ঠাগত প্রাণ করে তুলবেন না। বরং হাতের মুঠোটা খুলে স্বামীকে প্রাণ ভরে শ্বাস নিতে দিন।

স্ত্রী ৪৯৮এ ধারায় অভিযোগ করলে

অভিযোগ মানেই গ্রেফতার নয় : পীড়িত পুরুষ পতি পরিষদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও এই আইনের চূড়ান্ত অপব্যবহারের ফলে সুপ্রিম কোর্ট ৯টা দিক উল্লেখ করে একটা গাইডলাইন দিয়েছে। তার মধ্যে একটা বিষয় খুব জরুরি, এখন আর স্ত্রী অভিযোগ করা মাত্রই স্বামীকে গ্রেফতার করতে পারবে না স্থানীয় থানা। ৪১ এ ধারায় থানা স্বামীকে নোটিশ পাঠাবে। নোটিশের বয়ান হবে এই রকম, আপনার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ জমা পড়েছে। আপনি থানায় এসে যোগাযোগ করুন।

থানায় না গেলে গ্রেফতার হতে হবে

নোটিশ পাওয়ার পর স্বামীকে থানায় যেতেই হবে। না গেলে এক্ষেত্রে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারে। এই নোটিশ না দিয়ে যদি পুলিশ স্বামীকে বা পরিবারের অন্যদের গ্রেফতার করে, তাহলে পুলিশের বিরুদ্ধে স্বামী নিজেই মামলা করতে পারেন। এখন এই নিয়ম সব থানাই মেনে নিয়েছে।

নির্যাতিত স্বামীরা কোথায় আইনি সাহায্য পাবেন

নির্যাতিত স্বামী বা পুরুষরা আইনি অধিকার বুঝে নিতে যোগাযোগ করতে পারেন এই সব ঠিকানায়-

(১) পীড়িত পুরুষ পতি পরিষদ, ১১/সি, রাজা বি এন রায় স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৭

(২) অভিযান ইন্ডিয়া ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন, ২৬/৫বি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

শীতের পিঠে-পুলি

পৌষ সংক্রান্তি, শীতের আমেজ, নতুন গুড়-এই সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পিঠের অতুলনীয় স্বাদ ও মন ভরানো গন্ধ। তাই সহজেই কী করে বাড়িতে পিঠে বানাবেন তার হদিশ দিলেন অরুণা পুরকাইত।

পাটিসাপটা

উপকরণ : ময়দা ২০০ গ্রাম, সুজি ২০০ গ্রাম, চিনি বা নতুন গুড় ৩৫০ গ্রাম, নারকেল ১টা (মাজারি মাপের), খোয়া ক্ষীর ২০০ গ্রাম, কিশমিশ ২০/২৫টা, দুধ ২৫০ গ্রাম।

প্রণালী : সুজি, ময়দা ও চিনি ভালো করে মেখে দুধ দিয়ে গোলা তৈরি করুন। মিষ্টি বেশি দিলে পিঠে পাত্র থেকে উঠতে চাইবে না।

তাই মিষ্টিটা বুঝে দিতে হবে। পুরের জন্য নারকেল, খোয়া ক্ষীর, চিনি ভালো করে মেখে গ্যাসে বসিয়ে পাক দিতে থাকুন। নাড়ুর চেয়ে একটু কম পাক দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, নাড়ুর মতো যেন শক্ত না হয়। এরপর নন-স্টিক তাওয়ায় তেল মাখিয়ে, এক হাতা গোলা দিয়ে, ডিমের ওমলেটের মতো করে গোলাটাকে ছড়িয়ে দিয়ে, মাঝে নারকোল-ক্ষীরের পুর দিয়ে ওমলেটের মতো মুড়িয়ে দিন। পিঠে তৈরি হলে প্রত্যেকটা পিঠের ওপর, মাঝখানে একটা করে কিশমিশ দিলে পাটি সাপটার চেহারা বেশ সুন্দর হবে।

গোকুল পিঠে

উপকরণ : মাজারি মাপের নারকেল ১টা, চিনি ৪০০ গ্রাম, সাদা তেল পরিমাণ মতো, ময়দা পরিমাণ মতো, অল্প ক্ষীর, কিশমিশ ২৫ গ্রাম।

প্রণালী : নারকেল কুরিয়ে রাখতে হবে। ২০০ গ্রাম চিনি ও জল ফুটিয়ে পাতলা চিনির সিরাপ করে রাখুন। নারকোল কোরা ও বাকি ২০০ গ্রাম চিনি ভালো করে মিশিয়ে গ্যাসে পাক দিতে হবে। যখন নারকেলটা কড়া থেকে উঠে আসবে ও মণ্ড মতো হবে, তখন বুঝবেন নারকেলের পাক ঠিক হয়েছে। এবার ক্ষীর দিয়ে আর একটু নেড়ে চেড়ে নিন। নারকেলের ওপর কিশমিশ ছড়িয়ে দিন। ঠান্ডা হলে ওই মণ্ড থেকে আন্দাজ মতো ১৫টা বল করে সেগুলো আবার চ্যাপ্টা করে নিন। ঠিক যেন রুটি বা লুচির লেচি। অল্প ময়দা জল দিয়ে ঘন করে গুলে রাখুন। সেই গোলায়, নারকেলের লেচিগুলো চুবিয়ে এক-এক করে সাদা তেলে ভেজে নিয়ে আগে জ্বাল দেওয়া সিরায় চুবিয়ে রাখুন। মিনিট দশ-পনেরো পরে ওগুলো প্লেটে সাজিয়ে দিন। গোকুল পিঠে তৈরি। মুখে দিলেই গলে যাবে।

দুধ-পুলি

উপকরণ : সুজি ২৫০ গ্রাম, ময়দা ১০০ গ্রাম, গুড় বা পাটালি ৪০০ গ্রাম, দুধ ২ কেজি, নারকেল ১টা বড়ো।

প্রণালী : কড়াইতে পরিমাণ মতো জল ফুটিয়ে তাতে সুজি ও ময়দা ঢেলে, একটু জ্বাল দিলে কাই তৈরি হয়ে যাবে। কাইটা নামিয়ে ঠান্ডা হলে হাতে একটু ময়দা দিয়ে গোটা কুড়ি পাতলা পাতলা লুচি করে নিন। আগেই নারকেল কোরা ও ২৫০ গ্রাম গুড় ফুটিয়ে পুর বানিয়ে রাখতে হবে। এবার ওই লুচির মধ্যে পুর ভরে পুলির আকারে গড়ে নিতে হবে। সব পুলি গড়া হলে, দুধ একটু ঘন করে ফুটিয়ে তাতে পুলিগুলো ছেড়ে দিন। অনেকে গুড়টা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে সুজি-ময়দা কাই দিয়ে তৈরি, লম্বা লম্বা চুষিও তৈরি করে দেন। তাতে দুধ-পুলির স্বাদের বিশেষ হেরফের হয় না। তবে দেখতে ভাল লাগে ও পরিমাণও বাড়ে।

এরপর ২৬ পাতায়

কাছেপিঠে শীতের আমেজে পিকনিক

শীত মানেই পিকনিক। শীতে কাছেপিঠে ঘুরতে যাওয়ার বেশ কিছু জায়গা রয়েছে। যেখানে গিয়ে শীতের ছুটি উপভোগ করা যায়। আমাদের রাজ্যে এই রকম জায়গার অভাব নেই। এই বিভাগে আমরা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরব জেলাভিত্তিক পিকনিকের স্পট। এবার দ্বিতীয় পর্ব।

উত্তর ২৪ পরগনা

বিভূতিভূষণ ঘাট : বনগাঁর ইছামতীর তীরে বিভূতিভূষণ ঘাট পিকনিক করার একটি মনোরম জায়গা। বনগাঁ স্টেশনে নেমে চাকদহ রোড ধরে এগিয়ে শ্রীপল্লি-বারাকপুর মোড় থেকে বাজিতপুর মোড় হয়ে এক কিলোমিটার গেলেই আপনি পৌঁছে যাবেন বিভূতিভূষণ ঘাটে।

সংহতি পার্ক : অশোকনগর সংহতি পার্কও পিকনিকের জনপ্রিয় স্পট। কল্যাণগড় পুরসভা এই পিকনিক স্পটটি পরিচালনা করে। শিয়ালদহ থেকে বনগাঁ বা হাবড়া লোকাল ধরে অশোকনগর স্টেশনে নেমে অটোতে ৫ মিনিটের পথ এই সংহতি পার্ক। পার্কে টয়ট্রেন ও বোটিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। পার্কের বাইরে মাঠে পিকনিক করার জায়গা রয়েছে।

সহস্রাব্দ বিজ্ঞান উদ্যান : বনগাঁ শাখার হাবড়া স্টেশনে নেমে যেতে হয় সহস্রাব্দ বিজ্ঞান উদ্যান। রোপওয়ে, বোটিংয়ের পাশাপাশি এখানে নানা মডেলের মাধ্যমে শক্তির রূপান্তর ব্যাখা করা হয়েছে। পার্কের মধ্যে পিকনিক করতে দেওয়া হয় না। বাইরে পিকনিক করার জায়গা রয়েছে।

পারমাদন ফরেস্ট : উত্তর ২৪ পরগনার জনপ্রিয় পিকনিক স্পটগুলির মধ্যে পারমাদন ফরেস্ট অন্যতম। বনগাঁ মহকুমার বাগদা থানা এলাকায় এই ফরেস্টটি রয়েছে। বনগাঁ থেকে ৩৬ কিলোমিটার দূরত্বে পারমাদন ফরেস্ট বা বিভূতিভূষণ অভয়ারণ্য। ৯৪ হেক্টর জমির ওপর অভয়ারণ্যটি গড়ে উঠেছে। এখানে জঙ্গল, মিনি-জু, ইছামতীর বুকে নৌকাবিহার সবকিছুর আনন্দ পাওয়া যাবে। শিয়ালদহ থেকে ট্রেন ধরে বনগাঁ স্টেশনে নেমে গাড়ি ভাড়া করতে হবে। আর বাসে যেতে চাইলে মতিগঞ্জ বাজার থেকে দত্তফুলিয়াগামী বাসে উঠে নলডুগরিতে নামতে হবে। এখান থেকে ভ্যান রিক্সায় দেড় কিলোমিটার গেলেই পারমাদন অভয়ারণ্য। এছাড়া বাগদাগামী বাসে উঠে হেলেঞ্চা বাজারে নেমে সেখান থেকে অটো করে যাওয়া যায়। গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। বন দফতরের ট্যুরিস্ট লজও রয়েছে। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করতে পারেন বিভাগীয় বনাধিকারিকের সঙ্গে।

টাকি

ইছামতী নদীর ধারে পিকনিকের এক গুরুত্বপূর্ণ স্পট টাকি। ইছামতীর মাঝ বরাবর চলে গিয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত। একমাত্র বিজয়া দশমীর দিন ভারত-বাংলাদেশের

ঠাকুর বিসর্জনের নৌকাগুলো নদীতে মিলেমিশে এক হয়ে যায়। এই অপরূপ দৃশ্য দেখতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এখানে ভিড় জমান। বিজয়া দশমী ছাড়া শীতকালে পিকনিক করার জন্য প্রচুর মানুষ টাকিতে আসেন। ইছামতীর পাড়ে টাকি পুরসভার পিকনিক স্পট বনবীথি রয়েছে। পাশাপাশি বেসরকারিও অনেক পিকনিক স্পট মিলবে। এখনে পিকনিক করতে এসে ইছামতীতে নৌকাবিহার এক আলাদাই মজা। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে হাসনাবাদ লোকাল ধরে টাকি স্টেশনে নামতে হবে। আর সড়ক পথে যেতে হলে বারাসাতের চাঁপাডালি মোড় থেকে ডানদিকের রাস্তা টাকি রোড ধরে বসিরহাট হয়ে টাকি পৌঁছোনো যায়। অবশ্য সড়কপথের তুলনায় ট্রেনে টাকি যাওয়া অনেক বেশি সুবিধার।

মাছরাঙাদ্বীপ

নদীর বুকে জেগে ওঠা চরে বনভোজনের আনন্দ উপভোগ করতে হলে হুগলির সবুজদ্বীপ ছাড়াও আর একটা জায়গা হল হাসনাবাদের মাছরাঙাদ্বীপ। বলা যায়, ইছামতী নদীর বুকে এই মাছরাঙাদ্বীপ উত্তর ২৪ পরগনার সেরা পিকনিক স্পট। দ্বীপটার পাশ দিয়ে চলে গেছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত। এই দ্বীপের সৌন্দর্যায়ন করেছে হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতি। বর্ষাকালে দ্বীপটি নদীর জলে ডুবে যায়। শীতকালে চরটা জেগে ওঠে। শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে হাসনাবাদ স্টেশনে নামতে হবে। স্টেশন থেকে ১০ মিনিট হাঁটাপথ হাসনাবাদ লঞ্চঘাট। সেখান থেকে নৌকা করে দ্বীপে যেতে হয়। পিকনিক সেরে সন্ধ্যের মধ্যে দ্বীপ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। সামনে সীমান্ত বলে দ্বীপের কটেজে থাকার জন্য আগে থেকে পঞ্চায়ের সমিতি ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অনুমতি নিতে হয়। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করতে হবে হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে।

শীতের পিঠে-পুলি

২৪ পাতার পর

রস-পুলি

উপকরণ : মাজারি নারকেল ১টি, সুজি ১৫০ গ্রাম, চিনি ৪০০ গ্রাম, দুধ ১ কেজি।

প্রণালী : আগে দুধটা একটু ঘন করে ১৫০ গ্রাম চিনি দিয়ে জ্বাল দিয়ে নিন। নারকেল কুরিয়ে তার সঙ্গে ১৫০ গ্রাম সুজি ও ২৫০ গ্রাম চিনি মিশিয়ে জ্বাল দিন ঢিমে আঁচে, যতক্ষণ না নারকেল-সুজির মণ্ডটি নাড়ু পাকাবার উপযুক্ত হয়। গ্যাস থেকে মণ্ডটি নামিয়ে ছোটো ডিমের আকারে পাকাতে থাকুন। ওগুলো কিছুক্ষণ হাওয়ায় রাখলেই শক্ত হয়ে যাবে। এরপর ঘন করে জ্বাল দেওয়া দুধটা বসিয়ে, তার মধ্যে ওই ছোটো ছোটো নাড়ুগুলো ফেলে দিন। একটু ফুটে উঠলেই দুধ নামিয়ে ফেলবেন। চিনির বদলে পাটালি গুড়ও ব্যবহার করা যায়।

নয়া আঙ্গিকে গুপী গাইন বাঘা বাইন

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর গুপী-বাঘা চরিত্র দু'টি প্রাণ পেয়েছিল পৌত্র সত্যজিৎ রায়ের সিনেমায়। অর্ধশতক পেরিয়েও এই ছবির জনপ্রিয়তা এখনও আকাশছোঁয়া। সত্যজিতের সৃজনশীলতা, বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে এই সিনেমায়। তাঁর জন্মশতবর্ষে অন্য আঙ্গিকে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ফিরে দেখা হিসেবে এক সংকলন বেরোল। ১৩ নভেম্বর কলেজ স্ট্রিটের বইচিত্র সভাগৃহ থেকে এই বইয়ের উদ্বোধন করেন অধ্যাপক সঞ্জয়

মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি শুভেন্দু দাশমুন্সির সঙ্গে হাজির ছিলেন অন্য লেখক ও শিল্পীরাও। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'কে ফিরে দেখা এই সংকলনে রয়েছে প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা-সহ 'প্রসঙ্গে গুপী গাইন বাঘা বাইন' (বর্ণিক প্রকাশন)-এ গল্পের বিশ্লেষণ, চিত্রনাট্য, কমিকস, চলচ্চিত্রে ইতিহাস-ভূগোল, কল্পবিজ্ঞানের উপাদান, বিজ্ঞান-রাজনীতি, খাওয়া-দাওয়া, শিল্প নির্দেশনা-সাজসজ্জা, গুপী-বাঘার গান, গানের অনুবাদ-ছন্দ, ভূতের নাচ প্রভৃতি বিষয়ে ২৮টা প্রবন্ধ। রয়েছে গুপী-বাঘা বিষয়ক কালক্রমিক সালতামামি। অন্যদিকে, ১২ নভেম্বর 'শতবর্ষে সত্যজিৎ-প্রসঙ্গ : গুপী গাইন বাঘা বাইন' শীর্ষক মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী স্মারক বক্তৃতায় বললেন শঙ্করলাল ভট্টাচার্য ও দেবাশিস মুখোপাধ্যায়।

বিদ্যাসাগরকে নিয়ে স্মারক গ্রন্থ

সম্প্রতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের তুরীয়ানন্দ সভাগৃহে এক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। সংকলনের পোশাকি নাম 'অমিয়া সায়রে'। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মিশন গোলপার্কের সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ। ছিলেন ড. পল্লব সেনগুপ্ত, ড. বিকাশ সান্যাল, ড. বারিদবরণ ঘোষ ও ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়। কবি সুশীল মণ্ডল, স্বামী শিবপ্রসাদনন্দজী মহারাজ ও জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষও উপস্থিত ছিলেন। অসিতবরণ গিরি সম্পাদিত এই সংকলনে বিদ্যাসাগরের জীবন ও কাজের নানা দিক নিয়ে আলোকপাত করেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ, অধ্যাপক সতীপ্রসাদ মাইতি, ড. বিকাশ সান্যাল, ড. পল্লব সেনগুপ্ত, ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ও ড. বারিদবরণ ঘোষের মতো বিশিষ্টরা। সংকলনে রয়েছে তিনটি কবিতা। শিশু সাহিত্য সংসদ ও কথাশিল্পে এই সংকলনটি মিলবে।

শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে নজর কাড়বে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর রেট্রোস্পেকটিভ

চলতি বছরের ১৭ ডিসেম্বর থেকে শহরে 'ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশনাল শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'য়ের আসর বসতে চলেছে। সিনেমার এই উৎসব চলবে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। এবার এটি দ্বিতীয় বছরে পা দিল। উৎসবে থাকছে প্রয়াত পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর রেট্রোস্পেকটিভ। তাঁকে স্মরণ করে পরিচালকের 'ত্রয়োদশী' দেখানো হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তেরোটি কবিতা অবলম্বন করে পরিচালক তেরোটি শর্ট ফিল্ম বানিয়েছিলেন। ওই ছবিগুলো তেমনভাবে দর্শকদের সামনে প্রদর্শিত হয়নি। তেরোটি শর্ট ফিল্মের মধ্যে থেকে চার থেকে পাঁচটি শর্ট ফিল্ম দেখানো হবে ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশনাল শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। এই ফেস্টিভ্যালে দেশ-বিদেশের পরিচালকদের কাছ থেকে মোট তিনশোটি এন্ট্রি জমা পড়েছিল। যার মধ্যে থেকে ৯১টি ছবি নেওয়া হয়েছে। গত বছর প্রয়াত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছিল। তাঁর নামাঙ্কিত স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছিলেন অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তী। উৎসবের অধিকর্তা শুভঙ্কর মজুমদারের কথায়, 'আমরা ইনডিপেনডেন্ট ফিল্মকে সাপোর্ট করার জন্য এই ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করেছি। করোনা যোদ্ধাদের উৎসর্গ করেছি এই উৎসব। আমরা এবছর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তকে। সঙ্গে থাকছে তাঁর নামে পুরস্কার। ফেস্টিভ্যালের ওয়েবসাইটে বাছাই ছবির তালিকা থাকবে। করোনাবিধির কথা মাথায় রেখে এই বছরও উৎসব হবে অনলাইনে।'

কিশলয় জীবনের বাস্তব গল্প শোনাবে

মার্কশিটের নম্বরটাই কি জীবনের সব কিছু! এই মোক্ষম প্রশ্নটাই তুলে ধরেছেন পরিচালক আতিউল ইসলাম তাঁর 'কিশলয়' ছবিতে। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে এই ছবির ট্রেলার ও গান। থ্রিলার ভিত্তিক এই ছবিতে রয়েছে ছোট্ট একটি মেয়ের আত্মহত্যার পিছনের গল্প। প্রতিটা ছাত্রছাত্রীর জীবনে মার্কশিটের নম্বরই কি সব কিছু? নম্বর পাওয়ার চাপেই কি পড়ুয়াদের জীবনে প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা কাজ করে? এইসব প্রশ্নের উত্তর মিলবে এই ছবিতে। ছবিতে দেখানো হয়েছে ৭ বছরের মেয়ে অন্তরা বাড়ির সবার অজান্তে বেছে নিয়েছে আত্মহননের পথ। তবে আত্মহত্যা করার আগে সে খাতার সাদা পাতায় লিখে যায়, বাবা তাকে মেরেছে, বাবা খুব খারাপ। সুইসাইড নোটের ভিত্তিতে পুলিশ মেয়েটির বাবা অরিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে। সরকারি পক্ষের উকিল অরিত্রর শাস্তির ব্যবস্থা করে। ছবিতে উঠে এসেছে পারিবারিক অসামঞ্জস্যের নানা কাহিনী। গল্পের প্রতিটি বাঁকে রয়েছে সাসপেন্স। জীবনের কঠিন বাস্তবকে নিয়ে তৈরি হয়েছে 'কিশলয়'। ছবির গল্প লিখেছেন তানবির কাজী। সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়। গান গেয়েছেন সোনু নিগম, জুবিন গর্গ, ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুদীপ মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, দেবলীনা দত্ত, বিবেক ত্রিবেদী, দেবরাজ মুখোপাধ্যায়, ফাকিম মির্জা। অন্তরার ভূমিকায় দেখা যাবে শিশু শিল্পী অদ্রিজা মুখোপাধ্যায়কে। প্রযোজনায় আরণ্যক বন্দ্যোপাধ্যায়। আরণ্যক ফিল্মস প্রোডাকশনের ব্যানারে কিশলয় মুক্তি পাবে ১৯ নভেম্বর।

ডাঃ বক্সীতে নতুন লুকে শুভশ্রী

পরিচালক সপ্তাশ্ব বসুর মেডিক্যাল থ্রিলার 'ডঃ বক্সী'-তে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে কাজ করছেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। ছবির পোস্টারে তাঁকে একেবারে নতুন লুকে দেখা গেল।

সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, 'আমার চরিত্রের নাম মৃণালিনী সেন, একজন লেখিকা। খুব শক্তিশালী একটি চরিত্র। পোস্টারে আমার ছবি নিয়ে দর্শকদের মধ্যে নানা প্রশ্ন জাগছে। আর এটাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। চরিত্রটা নিয়ে বেশি কিছু এখন বলা যাবে না।'

'ডঃ বক্সী' আসলে মেডিক্যাল থ্রিলার। চিকিৎসা কেলেঙ্কারি ও এর বিরুদ্ধে ডঃ বক্সীর রুখে দাঁড়ানো নিয়ে তৈরি হয়েছে ছবির গল্প। ছবির পরতে পরতে নানারকম চমক থাকছে।

পরিচালক সপ্তাশ্বরের আগের ছবি 'প্রতিদ্বন্দ্বী'-তে ডঃ বক্সীর চরিত্রের আত্মপ্রকাশ হয়। ওই চরিত্রকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে এবার এই নতুন ছবি। তবে ডঃ বক্সী ছবির সঙ্গে আগের গল্পের কোনো মিল নেই। এখানে এক নতুন গল্প বলেছেন পরিচালক। ছবির কাহিনীকার অর্ণব ভৌমিক ও শুভাশিস গুহ। চিত্রনাট্য ও সংলাপ অর্ণব ভৌমিকের। ক্যামেরায় রয়েছেন প্রসেনজিৎ চৌধুরী। প্রযোজনায় সপ্তর্ষি সেন ও শুভদীপ ভৌমিক। ছবিতে শুভশ্রী ছাড়াও অন্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, বনি সেনগুপ্ত, মাহি কর, সৌমিজিৎ মজুমদার, রাহুল রায় প্রমুখ। খুব শিগগির ছবির শুটিং শুরু হবে।

কালী বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণ

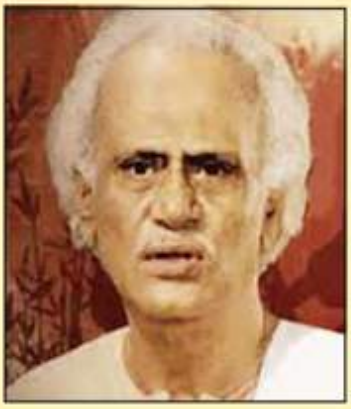

প্রতি মাসে অসমের করিমগঞ্জের 'উত্তরসূরি' গোষ্ঠী 'বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ' শীর্ষক এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করে।

১৪ নভেম্বর স্মরণ করা হয় কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ৬০ মিনিটের ওই আলোচনাচক্রের উপস্থাপক ছিলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক সময়ের সহ অভিনেতা শঙ্কর ঘোষ। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, গ্রুপ থিয়েটার, পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়, সিনেমায় নানান কঠিন চরিত্রে তাঁর অনবদ্য অভিনয় নিয়ে আলোচনা হয়। প্রসঙ্গক্রমে আসে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দি ছবিতে অভিনয়, বাংলা ছবি 'সুরের আগুন'-য়ের প্রযোজনার কথাও। শঙ্কর ঘোষ অযান্ত্রিক, লৌহকপাট, বরযাত্রী, তিনকন্যা, বাদশা, নীল আকাশের নীচে, আরোহী, বৌদি, বিধিলিপি ছবিতে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্য ধরনের চরিত্রে অভিনয়ের কথাও তুলে ধরেন। সহ-অভিনেতা আরো জানান, 'নীল আকাশের নীচে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় দেখে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কেঁদে ফেলেছিলেন।' শঙ্কর ঘোষ তাঁর অভিনীত বেশ কিছু ছবির গানও গেয়ে শোনান। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী রাজশ্রী মুখোপাধ্যায়।

মোহনবাগানের প্রথম জয় ছিল, ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়

সৃঞ্জয় ঠাকুর

সময়টা ছিল ১৯১১ সালের ২৯ জুলাই। ইস্ট ইয়র্কসকে ২-১ গোলে হারিয়ে মোহনবাগানের শিল্ড জয়। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম জয়ের আনন্দ। এটা নিছক কোনো ফুটবল টুর্নামেন্ট জয়ের আনন্দ ছিল না। ছিল একটা জাতির স্বপ্নপূরণের দিন। একটা জাতি কতটা মানসিকভাবে দুর্বল ও স্বার্থপর হলে কিছু ইংরেজ বাইরে থেকে এসে ভারতীয়দের ওপর ছড়ি ঘোরাতে পারে, অত্যাচার করতে পারে বা তাদের মানসিকতাকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে। অযোগ্য নেতৃত্বের জন্য ওই যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হয়। নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও লোভ কতটা মারাত্মক হতে পারে তারও এক প্রমাণ পলাশীর যুদ্ধ। ঠিক তার ১০০ বছর পর সিপাইরা প্রথম বিদ্রোহের চেষ্টা করে। কিন্তু দাসত্ব আমাদের রক্তে মিশে যাওয়ায় সেদিন আমরা উঠে দাঁড়াতে পারিনি। শুধু ইংরেজ শাসন নয়, আমরা যদি ফিরে যাই ১৫২৬ সালে, যখন বাবর ভারতে আসেন। তখনও আমরা স্বার্থপরতা, বিভেদ ও দিশাহীনতার পরিচয় দিয়েছিলাম। নেতাদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ বা লজ্জা ছিল না, যখন ৭০ জন মুসলিম ১৭ কোটি ভারতীয়দের ওপর জুলুম চালিয়েছিল। তারই পুনরাবৃত্তি হয় ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে। তখন ইংরেজরা দখল নিতে শিখল। আর ওই সময় থেকে দাসত্ববোধ আমাদের নৈতিক ভাবধারা নষ্ট করে দেয়। যার ফলে আজও আমরা মাথা উঁচু করে চলতে পারলাম না। বরং যারা এগোনোর চেষ্টা করে তাঁদের আমরা পেছন থেকে টেনে ধরি। আসলে আমাদের স্বাধীনতা, ন্যায়বোধ, সততা সব কিছু নষ্ট হয়ে গেছে দিনের পর দিন গোলামি করে। একটা গল্প পড়েছিলাম হংকং-র লোকেরা ভারতীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় না। কারণ জানতে গিয়ে বোঝা গেল তাঁদের ভাবধারা-ওরা (হংকং-এর লোকেরা) বলে জেনারেল ডায়ার যখন জালিয়ানওয়ালাবাগে 'ফায়ারের' আদেশ দেন, তখন সেখানে একটাও ইংরেজ পুলিশ ছিল না। তাহলে ১৩০০জন নিরীহ ভারতীয়দের হত্যা করল কারা? একজনও ভারতীয় পুলিশ জেনারেল ডায়ারকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো না কেন? কারণ ওই দাসত্ববোধ! আর দাসত্ববোধ যখন অভ্যাসে পরিণত হয় তখন তার নিজস্ব ক্ষমতা শূন্যে পরিণত হয়। একবার ভেবে দেখুন, সারা দেশে মাত্র ২০০০ ইংরেজ ছিল আর তারা ৩৮ কোটি ভারতীয়দের ওপর অত্যাচার চালাল এটা কী সম্ভব? তার মানে শুধু ইংরেজরা নয়, ভারতীয়রাই ভারতবাসীর ওপর অত্যাচার চালায়। অত্যাচার করে ভাই ভাইয়ের ওপর, বোন বোনের ওপর। যার ফলে, ১৯১১ সালের ২৯ জুলাই মোহনবাগানের যে জয় হয়েছিল তা ছিল জাতীর জয়। সংঘবদ্ধ জয়। ওই প্রথম জয় যা বলে দিয়েছিল, আমরা এক হলে ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়িয়ে ছাড়ব। কিন্তু দাসত্ববোধ থেকে বেরিয়ে আসতে তো সময় লাগবেই। এই জয় আমাদের জাতীর জয়ের সূচক হয়ে উঠেছিল। এই খেলায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত জুতো পরা ইংরেজরা খালি পায়ের ভারতীয়দের কাছে হেরেছিল। তার মানে হল, অদম্য জেদ একটা দল বা জাতিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে।

আমরা যদি নিজেদের সংস্কৃতির দিকে তাকাই, ১৮৮৯ সালের ১৫ আগস্ট মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়। শ্যামপুকুরের বোস পরিবার, ফড়িয়াপুকুরের মিত্র পরিবার ও বাগবাজারের সেন পরিবারের বিশেষ অবদান ছিল এই দল তৈরির পেছনে। অদ্ভুতভাবে আমরা দেখি, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। সুতরাং মোহনবাগানের জন্মদিন নতুন ভারতের জন্মদিনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল। ফলে ১৯১১ সালের ২৯ জুলাই মোহনবাগানের ঐতিহাসিক জয়ে প্রথমবার ব্রিটিশদের হারানোর স্বাদ মেলে। তারই স্বরূপ স্বাধীনতার স্বাদ।